KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সনৎ বসু অ্যাভেনিউ, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীপ ঘোষাল
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৩/৯ ৫৩/১০ ৫৩/১১	Year of Publication : পৌষ ১৩৯৯ // Jan 1993 মাঘ ১৩৯৯ // Feb 1993 ফাল্গুন ১৩৯৯ // March 1993
	Condition : Brittle / Good
Editor : আবদুল হাই	Remarks :

CD-Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৯ জানুয়ারী, ১৯৯৩

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অবদান পর্যালোচনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

'মাটি' নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎবিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনা।

বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক লেখার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ সন্দর্ভ।

মন্দির-মসজিদ নিয়ে রক্তাক্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে সুরজিৎ দাশগুপ্ত-র প্রতিবেদন 'সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ—কিছু প্রশ্ন, কিছু তথ্য'।

উনবিংশ শতাব্দীর একজন নাস্তিক মুসলমান পণ্ডিত প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপকের তথ্যসমৃদ্ধ আলেখ্য।

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের জলপাইগুড়ি এবং চারদশকের রাজনীতি নিয়ে দুখানি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুনীল সেন।

চতুরঙ্গে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র সটীক সংস্করণের সমালোচনার জবাবে অরুণ নাগের দীর্ঘ তথ্যসম্বলিত অভিমত।

চা-বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন একদা এই আন্দোলনের নেতা কল্পতরু সেনগুপ্ত।

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 22-6745 (3 lines)
22-6746
22-6747

Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৯

জানুয়ারি ১৯৯৩

পৌষ ১৩৯৯

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা : এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ৫৭৬
মাটি সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৮৫
সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ : কিছু প্রশ্ন কিছু তথ্য সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬০০
বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান : পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত অসীম মুখোপাধ্যায় ৬০৭

কবিতা

স্পষ্ট কথার সময় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৫৮০
অনিমেষ ভালোই আছে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৫৮১
বায়ুবন্দনা ১ আনন্দ ঘোষ হাজরা ৫৮৩
শিকড়ের প্রার্থনা অজিত বাইরী ৫৮৪

গল্প

বিফল প্রতিযোগী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫৯০

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রসঙ্গ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের জলপাইগুড়ি এবং রাজনীতির চার দশক সুনীল সেন ৬১৭
গ্রামীণ বিকাশের সমস্যা এবং কুমিল্লার আদর্শ অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৬১৯
বাংলার লোককথা নিবেদিতা চক্রবর্তী ৬২০
উনিশ শতকের তিনজন বাঙালি মনীষীর জীবন ও কীর্তি রণেন্দ্রনাথ দেব ৬২২
জীবনানন্দের কবিতার ভবিষ্যৎ বিজলি সরকার ৬২৫

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

উনবিংশ শতাব্দীর একজন নাস্তিক মুসলমান পণ্ডিত শহীদুল ইসলাম ৬২৭
রসশাস্ত্রের আলোকে শেক্সপীয়রের ওথেলো রাত্রি রায় ৬৩৩

মতামত

প্রসঙ্গ সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা অরুণ নাগ ৬৩৯
চা বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন কল্পতরু সেনগুপ্ত ৬৪১
'মাটি' শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা নয় সন্তোষকুমার দে ৬৪৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭

শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

"বিবাদ নয়.....সহায়তা

বিনাশ নয়.....গ্রহণ

মতবিরোধ নয়.....

সমন্বয় ও শান্তি"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৪৪/৯৩

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা : এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব (১৮৯৩-১৯৫৬)

মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা যথার্থ অর্থেই এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব বলা যায়—যা তাঁর জীবন কালেই কিংবদন্তী হয়েছিল। অত্যন্ত সাধারণ দরিদ্র ঘরে ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর এখনকার বাংলা দেশের ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে জগন্নাথ সাহা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর পঞ্চম সন্তান রূপে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা পাঁচ ভাই ও তিন ভগিনী। তাঁদের পরিবারের অন্নসংস্থান হত একটা ছোট দোকান থেকে। আর এতই সীমিত যে অনেক কষ্টের সঙ্গে তাঁদের সংসার চলত। গ্রামে সে সময়ে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। সব চেয়ে কাছের ইংরেজি পড়ানর স্কুল ছিল সাত মাইল দূরে। ফলে তাঁর জন্য সেখানকার একজন স্থানীয় চিকিৎসকের বদান্যতায় খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই চিকিৎসক ভদ্রলোক এই বিরল প্রতিভার প্রথম আশ্রয়স্থল এবং সাহায্যকারী হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। ১৯০৫ সালে মিডল স্কুল পরীক্ষায় মেঘনাদ প্রথম হয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু দেশ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশপ্রাণ মেঘনাদ স্কুলে তৎকালীন লাটসাহেবের পরিদর্শনের সময় বয়কটে যোগ দেন। ফলস্বরূপ তাঁর সরকারি বৃত্তি চলে যায়। শাস্তি স্বরূপ তিনি আরও কিছু ছাত্রের সঙ্গে বিতাড়িত হন।

তারপর তিনি কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে যোগ দেন এবং ১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। মেঘনাদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং একদিকে যেমন গণিতে অন্যদিকে তেমন ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃতে) তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। সেই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত সারা বাংলা বাইবেল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সমস্ত বাংলার স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ সালে তিনি Intermediate বিজ্ঞানে (I.Sc.) সারা বাংলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, গণিতে ও রসায়নে প্রথম হন। তাছাড়া তিনি জার্মান ভাষা পরীক্ষায় নিজে নিজে পড়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর কলেজে এই ভাষা পড়ানর কোনও ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর পঠন পাঠনের বন্দোবস্ত হয়। তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কেবল ভারতেই নয় সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত নাম, যেমন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া নীলরতন ধর তাঁর দুই বৎসর আগে পড়তেন। অধ্যাপকদের মধ্যে রসায়নে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পদার্থ বিদ্যায় জগদীশচন্দ্র বসু এবং গণিতে ডি, এল, মল্লিক ও অধ্যাপক মুনিশ ছিলেন। বি. এস্. সি (অনার্স) এবং এম. এস্. সি এই দুইটি পরীক্ষাতেই মেঘনাদ দ্বিতীয় স্থান এবং সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রথম স্থান অধিকার করেন। দুজনেই ১৯১৬ সালে ফলিত গণিত (Applied Mathematics) নিয়ে এম. এস্. সি. পাশ করেন। প্রথম দিকে তাঁর ইচ্ছা

ছিল সর্বভারতীয় ফিন্যান্স পরীক্ষায় বসার জন্য কিন্তু তৎকালীন সরকার তাঁর ঢাকার ঘটনা মনে রেখে তাঁকে পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দেন নি। এই সময় কলকাতায় দুই জায়গায় ছাত্র পড়িয়ে তিনি কোন রকমে নিজের ও ভাইএর গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করতেন। এই সময় ১৯১৬ সালে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং দানবীর তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানে। নতুন বিজ্ঞান কলেজে তিনি ও সত্যেন বসু গণিত বিভাগে লেক্চারার পদে যোগ দেন। পরে তাঁরা দুইজনই পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে চলে যান। তার পর এক বৎসর স্যার সি. ভি. রামন পালিত অধ্যাপক রূপে বিজ্ঞান কলেজে আসেন। যদিও তিনি পদার্থ বিদ্যা বিভাগে নানাদিকে অধ্যাপনা শুরু করেন পরে তিনি জ্যোতি-পদার্থ বিদ্যায় (Astrophysics) বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯১৯ সালে সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি. ডিগ্রীতে ভূষিত হন। বহু বৈজ্ঞানিক কর্মের মধ্যে তাঁর অধিক তাপে আয়নায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার প্রয়োগ (Theory of thermal ionization)—এই তত্ত্বের জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত। পরবর্তী কালে প্রায় ৪ দশকে (১৯১৯-১৯৫৬) মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু উচ্চস্তরের গবেষণা করেছেন। ১৯২৭ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে সাহা ইংল্যাণ্ডের রসায়ন কেলো (F.R.S.) পদে বৃত হন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর এলাহাবাদের ছাত্র ডাঃ দৌলত সিং কোঠারীর দ্বারা লিখিত ও সংকলিত আছে। কিন্তু কৃতী বিজ্ঞানী হওয়া ছাড়াও সাহা ছিলেন বিজ্ঞান সংস্থার সংগঠক হিসাবেও প্রসিদ্ধ। ১৯৩৮ সালে তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং নব কলেবর ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ফর্ দি কালটিভেশন অফ্ সায়েন্স (যেটা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র) তাকে পুনর্গঠিত করে নতুন জীবন দান করেন। প্রথম আণবিক বীক্ষণাগার সৃষ্টি (১৯৪৮) (Nuclear Physics Research Laboratory) তাঁর বহু কীর্তির অন্যতম। বহু বিজ্ঞান সংস্থা, বিজ্ঞানীদের সংস্থা যেমন এক্যাডেমি অফ্ সায়েন্স, জাতীয় বিজ্ঞান এক্যাডেমি (দ্বিতীয় সভাপতি), এসিয়াটিক সোসাইটি, সি. এস. আই. আর (C.S.I.R.), কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণাগার (C.G.C.R.I) প্রভৃতি তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত। 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' (Science and Culture) পত্রিকার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান সাংবাদিক সংস্থা (Indian Science News Association)-ও তাঁরই সৃষ্টি। এরকম বহু প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে আছে যার প্রতিষ্ঠা বা কার্য-কলাপের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিদেশে তিনি বহুবার গিয়েছেন এবং বিভিন্ন উচ্চ কোটীর বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কাজ-কর্ম করেছেন যার পূর্ণ বিবরণ ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমি প্রকাশিত জীবন বৃত্তান্তে পাওয়া যাবে। ১৯৫১ সালে তিনি কলিকাতা উত্তর পূর্ব কেন্দ্র থেকে লোক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সাংসদ থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি-শিক্ষা, শিল্পনীতি, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, আণবিক শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তখনকার লোক সভায় তিনি বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় ও এলাহাবাদে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রগণ ও অনুরাগীরা তাঁর ৬০তম জন্মোৎসব পালন করেন। এই সময় একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, নাম "অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—তাঁর জীবন, কর্ম এবং জীবনদর্শন" লেখক এস এন সেন। আরও দুই বৎসর তিনি জীবিত থাকেন। সে সময় তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাচ্ছিল না, প্রধানতঃ উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির কারণে। দিল্লীতে ১৯৫৬ সালে যোজনা ভবনের অনতিদূরে যাওয়ার সময় হঠাৎ তিনি রাস্তায় পড়ে যান। এই ঘটনার পর ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯১৮ সালে তিনি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ অজিতকুমার সাহা আণবিক বিজ্ঞানী ও আণবিক বীক্ষণাগারের অধ্যাপক ছিলেন। অন্যেরাও সুপ্রতিষ্ঠিত। উপরে যা বলা হয়েছে তা হল ড. মেঘনাদ সাহার কর্মময় ও কর্মবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ততম বৃত্তান্ত।

কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবেই নয়—ডা. মেঘনাদ সাহার আরও একটা আলাদা আরও বর্ণময় এবং ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে ২৫ বৎসরের জাতি-ও-সমাজ-চিন্তক একজন নেতা হিসাবে পরিচয় আছে; সে ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তেমনই পথিকৃৎ সমাজ-চিন্তক হিসাবে তাঁর প্রচেষ্টার ইতিহাসও আমাদের অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা দাবি করে। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হল। একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তাঁর প্রাক্তন ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিক ড. শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ওরিয়েন্ট লংম্যান কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত *Collected Works of Meghnad*

Saha—গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে সন্নিবিষ্ট আছে।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বৎসর ধরে বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার চিন্তা ধারা কী ছিল, কীভাবে জাতির উন্নয়নের চেষ্টায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে-ছিলেন তার স্বাক্ষর তাঁর রচনাবলীতে বর্তমান। প্রধানতঃ যে বিষয়গুলি নিয়ে ড. সাহা নিজের বিপুল প্রতিভার একটা বড় অংশকে ব্যয় করেছিলেন সেগুলি হল যথাক্রমে—(১) নদী সম্পদের সদ্ব্যবহার ও পরিকল্পনা (২) বিভিন্ন উৎস থেকে শক্তি (৩) জালানি (৪) বিদ্যুৎ (৫) জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত বিকাশ (৬) শিল্পায়ন এবং (৭) যথাযথ পরিকল্পনা (৮) যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ (৯) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন (১০) ভারতের রাজ্যগুলিকে পুনরায় সংগঠিত করা ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে খণ্ডিত ভারতবর্ষে যেসব মৌলিক সমস্যার সমাধানে সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন তার সবগুলির ড. সাহার চিন্তার মধ্যে ছিল। বন্যা ও তার সমস্যা তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হয়ে ছোটবেলায় দেখেছিলেন। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গ প্লাবনের পর বন্যাত্রাণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তিনি ও সুভাষচন্দ্র বসু একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, ১৯৩০ সাল থেকে বন্যা ও তার সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধ্যয়ন করেছিলেন। পদার্থবিদ হিসাবে তিনি বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের সময় তিনি টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞান কলেজে এসে একটা নদীপ্রবাহ ও প্রপাতের মডেল পরীক্ষাগার করেছিলেন। এর থেকে নদী গবেষণা কেন্দ্র বা River Research Institute-এর উদ্ভব হয়। তাঁর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, যা তিনি অসংখ্য প্রবন্ধের সাহায্যে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে সকলকে জানাবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট; কেননা এগুলি পরে দামোদর ভাকড়ানঙ্গল ইত্যাদি নানা সার্থক পরিকল্পনায় রূপায়িত হয়েছে। ১৯২১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আয়োজিত সারা বাংলা যুব সম্মেলনে যুবকদের বলেছিলেন যে আলস্য ত্যাগ করে দারিদ্র্য দূর করার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে, বিদেশীদের হাত থেকে ব্যবসা বাণিজ্য নিজেদের হাতে নিতে। শিল্প-স্থাপন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন। মেঘনাদ সাহা আহ্বান জানিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকদের গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে। এজন্য তিনি রাজনীতিতে নামতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। জালানি তেল (পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য) যা না পাওয়া গেলে কী অবস্থা হতে পারে তা তিনি ১৯৪২ সালে একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত দিয়ে, "তেল ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ" নামে একটা লেখায়। তাঁর মৃত্যুর ২০ বৎসর পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভারতে নির্মম ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সূফল হল যে সুভাষচন্দ্রের যখন কংগ্রেসে সভাপতি হন তখন তাঁকে "জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি" গড়তে বলেন। তাঁরই পরামর্শে জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করা হয় এবং মেঘনাদ সাহা মূল কমিটির সদস্যরূপে 'জালানি ও প্রযুক্তিবিদ্যা' উপসমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর অন্য বন্ধুরা যেমন ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ড. শিশিরকুমার মিত্র এবং ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও কমিটির বিবিধ কাজে সংযুক্ত ছিলেন। কমিটিতে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বলতেন যে 'স্বাধীনতার পর শিল্পায়ন হবে "জোর কদমে যাত্রা" (Forced March) ।

স্বাধীনতার পরে জওহরলাল নেহেরু যখন প্রধানমন্ত্রী তখন মেঘনাদ বিরোধী বামদল সমর্থিত সদস্য এবং অনেক সময় তাঁর কঠোর সমালোচনা জওহরলালকে বিচলিত করত। কিন্তু কর্তব্য বোধে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। ১৯৫৩ সালে তিনি 'Rethinking Our Future' বা "আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুনরায় ভাবনা" নামক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা পরে "Science and Culture" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি পরিকল্পনার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছিলেন যে "পরিকল্পনাটি যদি আমূল পরিবর্তিত না হয় তাহলে আসবে না আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা; আমাদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বজায় থাকবে এবং আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে।" ইস্পাত উৎপাদন তুলনা করে তিনি উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের নগণ্যতাকে দেখিয়ে এবং তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, "শিল্পসমৃদ্ধ না হলে কোন দেশ কেবল জনসংখ্যার ভিত্তিতে বা আয়তনের ভিত্তিতে 'শক্তি'

হয় না, সেখানের মানবসম্পদকে প্রায় গোসম্পদের মতই হতে হয় এবং পিছিয়ে যেতে হয়।" প্রকাশের আগে তিনি রচনাটি বিভিন্ন পরিকল্পনা সমিতির সদস্য, বহু রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রীকে পাঠিয়ে তাঁদের সমালোচনা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি নানা প্রতিপাদ্য প্রমাণিত করেছিলেন দুটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে; আলোচনাকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন (১) একটি জাতীয় অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট (National Economic Budget) না হলে কোন পরিকল্পনা সম্ভব নয় এবং তাঁর মতে পরিকল্পনা পরিষদের সদস্যরা মোটেই এবিষয়ে অবহিত ছিলেন না বা সজাগ ছিলেন না। (২) যে তিনটী বিষয় পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে তা হল (i) জাতীয় লগ্নীর হার (ii) লগ্নী থেকে উদ্বৃত্ত আয়ের হার (iii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তিনি বলেছিলেন এ সম্বন্ধে তৎকালীন পরিকল্পনায় কিছু সংলগ্ন চিন্তা হয় নি। (৩) সরকারের মূলধন লগ্নীর নীতি এবং শিল্পায়ন নীতি। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে ১৯৯৮ সালের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সব কটি সুপারিশ বাদ দিয়ে নতুন পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হল যা শ্রমিকদলের নীতি অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের নীতিনয়। বিলাতের রক্ষণশীল দলের নীতিকে অনুসরণ করল।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ভালভাবেই বোঝা যাবে যে অধ্যাপক সাহার অবদান কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তিনি ভাবতেন এবং এজন্য অপ্রিয় সমালোচনা করতেও পশ্চাৎপদ হতেন না। তাঁর কর্মবহুল জীবনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া—এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সম্ভব নয়। কিন্তু যা বলা হয়েছে তাতে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। শতবর্ষের আলোকে আমাদের সকলের কর্তব্য হবে তাঁর আরব্ধ কর্মকে আবার সামনে রেখে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা।

আকর গ্রন্থ

1. Biographical Memoirs of the Fellow of the National Institute of Sciences in India Vol 2, (National Institute of Sciences of India, New Delhi—2 March 1970—Prof. D. S. Kothari

2. Collected Works of Meghnad Saha—Santimoy Chatterjee (Editor)—Orient Longman, Calcutta-1987

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তন ঘোষ প্রোফেসর ড. মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ইউ. জি. সি. সেন্টার অফ্ অ্যাডভ্যান্সড্ স্টাডিজ অন ন্যাচার‍্যাল প্রোডাক্ট্স্-এর উপদেষ্টা।

স্পষ্ট কথার সময়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যদি কোথাও অস্পষ্ট কিছু নেই, তাহ'লে তো দিব্যি বেঁচে আছি।
ধুলোকে ব'লবো ধুলো, যে ধুসুরি, তাকে ধুসুরি ছাড়া কিছু ব'লবো না।
আমার বা আমাদের ভিতর-বাহির দিয়ে কার হাওয়া আসে?
যা এখন, এখানে আছে, মানুষজনের মাঝে রূপটান গাছে,
তা-ই তো চলেছে ব'য়ে, কোনো একটা জায়গায় থাকলেই, শব্দ হ'য়ে ওঠে।
শব্দ আর ছবি শুধু শব্দ আর ছবি নয়, তার চেয়ে বেশি—
মানুষের সন্তপ্ত হৃদয়-মন কে মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেছে?
তার চাপা হৃৎধ্বনি, আর খনি-থেকে-তুলে-নেয়া অন্ধকার আলো,
আর যোজন যোজন জনহিতকারণের জের যদি ভেসে আসে,
তাহ'লে ব'লবো আমরা 'ভালোবাসি', কিংবা 'বাসি না'—
আর যা ব'লবো, যা এতোদিন চোখে প'ড়তো না,
তা একটা লাল বল, যুবকের নীল সার্ট, গরদের রুপোলি।
ঐ তো একটা গলি, এই তো দাঁড়িয়ে আছে সিনেমায় কিউ দেয়া লোক।
এই শোনো আমাদের দীর্ঘশ্বাস, আকাল কি কান পেতে আছে?
সবই কষ্টার্জিত শ্রম—এখন স্পষ্টভাবে জানা যাবে, কে মরেছে,
কারা বেঁচে আছে॥

অনিমেষ ভালোই আছে

(কু-হুই-কান বন্ধুবরেষু)

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

রেডিয়োর অকাতর বুলেটিনে এইমাত্র জানা গেল :
অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে,
অনিমেষ এখন ভালোই আছে।

দশটা-পাঁচটায় আর তার কোনোই অসুবিধে নেই,
ঠিক সময়েই আপিস করে,
ঠিক সময়েই বাড়ি ফেরে,
কথাবার্তা বলে স্বাভাবিক,
অনাবিল পান করার পর
সিগারেটের ধন্ধ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে
পারিবারিক পটু মমতায়
কত অনায়াসে সে টলে টলে
টেলিভিসন খুলে দেয়
আজকাল।

অনিমেষের আর একটুও জ্বর নেই,
দেহমনে কোনো সমস্যাই নেই তার,
এমন কি সুবোধ সিনেমার নটনটীদের মতো পাট-ভাঙা ভালোবাসার
চির-খাওয়া কোনো যৌন-যন্ত্রণা আর তার নেই,
হায়, ভালোবাসা!
ডাক্তার বলেছে,
নো প্রবলেম
সব ঠিক আছে।

তবে মাঝে মাঝে কে যেন মাথায় সহসা অসংখ্য আলপিনের হুল ফোটায়,
ওটা সাময়িক ;
হয়তো নিয়মিত কবিরাজী মতে কোষ্ঠ সাফ হচ্ছে না তার,
তাছাড়া বাইরে যে-রকম ঘোঁট-পাকানোর মতো ধোঁয়া-ধুলো,
তাই বুঝি!
বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়ে
পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে
গুনেগুনে কাকে যেন ছাপ্পান্ন ছোবল মারতে চায়,

বিছানাটা ঠিকমতো করা হয়নি ;
রাস্তায় চক্র চীৎকার,
অসুস্থ লোকেদের ;
হাসপাতাল-ক্লিনিকের মতো শিষ্ট শহরটা যেন
আধি দৈবের হাতে।
অনিমেষের ডাক্তার আর ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই,
কারণ, ডাক্তারই তো বলেছে,—
তিনি বলেছেন :
সব ঠিক হয়ে যাবে
আস্তে আস্তে।

রাত দুপুরে কাটা-পাঁঠার ঝটপটানির মতো দোর-দাবড়ানো নেই,
কূট জট-পাকানো গূঢ়-গণ্ডোগোলের মতো বেওয়ারিশ ভাবনার
সাফ করার দায়িত্ব তো ভব্য নাগরিকতার!
তাই নয়কি!

অনিমেষ সত্যিই ভালোর দিকে
আগেকার মতো সব ভালো হয়ে যাবে এবার,
ডাক্তার তাইই বলেছে,
হাসির হাঁদা হট্টগোল
চোখ ফেটে ফোয়ারার ছিটে
বাঁশ-চেরা ফিনকি চেঁচানি
সবই তো একই
অসুস্থতার!

রেডিয়োর দূরভাষিণী মিষ্টি করে জানালেন,
ডাক্তার বলেছেন,
অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে,
বেঁচে-থাকার কোনো যন্ত্রণাই নেই তার,
অনিমেষ এখন ভালোই আছে,
এবং অঙ্গেরা এখন ভালোর দিকে।

বায়ুবন্দনা—১

আনন্দ ঘোষ হাজরা

বাণিজ্য-বাতাস ছেড়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধ বাতাসে
আমরা এসেছি কত ম্লানসন্ধ্যা অতিক্রম ক'রে
অশ্ব-অক্ষ জুড়ে কত পণ্য ফেলে ফেলে
মনে ও মননে মেখে আমাদের মৃত যত ঘোড়াদের স্মৃতি ;
অতলান্ত পার হয়ে এখন সবেগে ধাও বৃষ্টি হয়ে ঝরো
ঝ'রে পড়ো সভ্যতার আতপ্ত নিদাঘে
ঝ'রে পড়ো দিনান্ত ক্লান্তির শেষে যে মানুষ ভাষাহীন ঘরে
ফিরে এসে শূন্যতার পানে চায় তার দেহলীতে—
অথবা উত্তরে যাও উড়ে উড়ে হিমাঙ্ক পেরিয়ে
এবং আবার নামো তুষারকুচির মতো শুভ্রতা ছড়িয়ে
ঘাসে ঘাসে মেপলের পাতায় পাতায় কিংবা পর্ণমোচী বীচে
নতমুখ উইলোর চোখে নামো প্রশান্তির প্রলেপ ছড়িয়ে।

শিকড়ের প্রার্থনা

অজিত বাইরী

একদিন জড়িয়েছিলে তোমরা আমাকে
সবুজে, সজলতায়।
কতো না রঙ্গভরে সোহাগে
বাহুর বন্ধনে বেঁধে, থেকেছিলে কণ্ঠলগ্না ;
ওষ্ঠ ধরেছিলে ওষ্ঠপ্রান্তে।

আজ রিক্ত ধূসর দিন। ধুলো ওড়ে।
স্মৃতি পোড়ে। আলস্য গুণগুণ করে মাছির স্বরে।
রাতে ঘাড় উঁচু করে ধরি ;
দূর আরো দূর নীলিমায় সুন্দরী রাত্রি,
যে তুমি নক্ষত্রখচিত তরুণী নৌকোর মতো বয়ে যেতে—
তুমি কোথায় ? দু'চোখে পিপাসা মরে গেছে।
জুবুথুবু দাঁড়িয়ে আছি মেরুদণ্ডে বিদ্ধ
স্থির যন্ত্রণার কাঁটা নিয়ে।

কার কাছে পেতে ধরবো অঞ্জলি ?
পাতা নেই, শুকনো শাখা—
শিকড়-শিকড়ে নিরুপায় বেঁচে আছি।
'জল দাও' বলে চিৎকার করার ক্ষমতাও
আজ বুঝি নিঃশেষ। মেলে আছি
বিশুষ্ক শিকড়, কোথায় চণ্ডালিকা ?
সুদিনের সোহাগী তরুলতা
তোমরা আমার এ-সময়ের নও।
অঞ্জলি পেতে আছি,
চণ্ডালিকা এসো, উপুড় করো কলসি
শিকড়ে আমার।

মাটি

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ

মাটির জটিলতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে একাধিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। যেহেতু এদের মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি ব্যাপক এবং অর্থবহ, রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগে মাটি সম্পর্কে কী কী জানা যায় তার আলোচনা করা যাক। নমুনা-মাটির বালি অংশে সাধারণত পাওয়া যায় সেইসব শিলাকণার অবশেষ যা থেকে মাটির উদ্ভব হয়েছে। অপ্‌টিক্যাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কণাগুলি কী ধরনের মিনারেল তা চিহ্নিত করা যায়। কাদা অংশে আছে মূলত দ্বিমাত্রিক রূপান্তরিত মাটি। বালি ও কাদার রাসায়নিক বিশ্লেষণেও তাদের বিভিন্নতা ধরা পড়ে, যেমন নিচের সারণি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

উপাদান (শতাংশ)

	SiO_2	AL_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	MnO
কাদার গড় নমুনা	47.5	17.9	8.3	1·3	8·9	3.0	1·7	0.23
বালির গড় নমুনা	33.0	13.0	5.0	—	0·2	10·0	6·0	—

তা ছাড়া কাদা অংশে আছে জৈব পদার্থ (0·5—2·0%) এবং জল (3—10%), যা বালি অংশে প্রায় থাকে না।

ভূপৃষ্ঠে তথা ভারতভূমির শিলায় প্রায় পনের-কুড়ি রকম মিনারেল-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এরাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। তারই মধ্যে কোন কোন মিনারেল বালি অংশে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ মিনারেলগুলি সমানভাবে মাটিতে রূপান্তরিত হয় না। কোন কোন মিনারেল সহজেই বিয়োজিত হয়, যেমন অলিভিন, হর্ন্‌ব্লেণ্ড, অগাইট, বায়োটাইট ইত্যাদি। আবার কোন কোন মিনারেল-এর বিয়োজন খুবই ধীরগতি, যেমন অ্যাল্‌বাইট, অর্থোক্লেজ, মাস্কোভাইট, ট্যুর্মালিন ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠের নানা ভাগে অবস্থিত এই সব মিনারেল-এর রাসায়নিক সংযুতি বিভিন্ন। কী কী বিয়োজন-সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে প্রাথমিক মিনারেলগুলি মাধ্যমিক মিনারেল-এ রূপান্তরিত হয় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

শিলার বিভিন্ন রূপ

বিয়োজন ইত্যাদি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার আগে শিলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। তাপাঙ্ক কমার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যস্থ তরল লাভা কঠিন আগ্নেয়শিলায় (গ্র্যানাইট, বেসাল্ট ইত্যাদিতে) পরিণত হয়। প্রধানত বৃষ্টির জলে বাহিত হয়ে আগ্নেয়শিলা অন্তত জমতে থাকে এবং নিজেদের চাপেই পাললিক্‌ শিলায় (স্যাণ্ডস্টোন, লাইমস্টোন ইত্যাদিতে) পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এই দুই প্রকার শিলা ক্রমশ উচ্চ চাপে ও তাপে রূপান্তরিত শিলায় (নিস, সিস্ট, স্লেট ইত্যাদিতে) পরিণত হয়। আগ্নেয়শিলায় যে সকল প্রাথমিক মিনারেল থাকে তাদের মধ্যে কোয়ার্জ, ফেলসপার, বায়োটাইট, অগাইট ও হর্ন্‌ব্লেণ্ড উল্লেখযোগ্য।

শিলা বিয়োজন পদ্ধতি

শিলা বিয়োজন তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক। তিনটি একই সঙ্গে চলতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভৌতিক বিয়োজনের অনতিবিলম্বে অন্য দুটি পদ্ধতি কার্যকরী হতে থাকে। ভৌতিক বিয়োজনের প্রধান কাজ হল কঠিন শিলাখণ্ডকে ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত করা। এই বিষয়ে সংক্ষেপে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একাধিক পদ্ধতিতে এই বিয়োজন সম্ভব। দিন ও রাত্রের তাপমাত্রার বিভেদের দরুন যে প্রসারণ-সংকোচন ঘটে তার ফলে শিলা ফেটে যায়। ফাটলের মধ্যে অবস্থিত জল পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে নিম্নতাপাঙ্কে বরফে পরিণত হয়। বরফের ঘন আয়তন জলের তুলনায় বেশি হওয়ার দরুন চাপ সৃষ্টি করে এবং ফাটা অংশ একাধিক ছোট ছোট খণ্ডে ভেঙে যায়। আবার শিলাস্থিত দ্বিযোজী ফেরাস আয়রণ জারিত হয়ে ত্রিযোজী ফেরিক আয়রণে পরিণত হয়, ফলে আয়রণ-আয়ন-এর ঘন আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং শিলাখণ্ডকে গুঁড়ো করতে সাহায্য করে। বস্তুত এটি ভৌতিক এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমন্বয়। তাছাড়া শিলাপৃষ্ঠ কঠিন হলেও কোন কোন শ্রেণীর গাছের শিকড় শিলাখণ্ড ভেদ করতে পারে এবং ক্রমশ নানাদিকে শিকড় প্রসারণের ফলে শিলাপৃষ্ঠ ভেঙে যায়। এই পদ্ধতিটিকে প্রকৃতপক্ষে জৈবিক ও ভৌতিক বিক্রিয়ার সমন্বয় বলা যায়। জলপ্রবাহে কিংবা বরফের সঙ্গে সংঘাতের ফলে শিলাখণ্ডগুলি উপর থেকে নিচে নামবার সময় পরস্পর ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং শিলাখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিয়োজনও শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক বিয়োজন নানা ধরনের। যেমন, জারণ, বিজারণ, আর্দ্রকরণ, আর্দ্র বিশ্লেষণ, দ্রবণ এবং কার্বনেটকরণ। জল অর্থাৎ বারিপাত, তাপমাত্রা, শিলার রাসায়নিক সংযুতি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন ও জৈবিক পদার্থের অস্তিত্ব কিংবা অভাব রাসায়নিক বিয়োজনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। কয়েকটি পাললিক শিলা যথা লাইমস্টোন, স্ল্যাগ্‌নেটাইট, ডলোমাইট ব্যতীত অন্য সব শিলা সিলিকেট অর্থাৎ, সিলিসিক অম্লের লবণ। এই সিলিকেটগুলি জলে একেবারেই দ্রবীভূত হয় না এবং অতিশয় জটিল প্রকৃতির। তা সত্ত্বেও উপরি উক্ত কারণগুলির প্রভাবে শিলাস্থিত সিলিকেট রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা কতকগুলি সরল যৌগে বিয়োজিত হয়। শিলাস্থিত সিলিকেটগুলিতে যে কটি ক্যাটায়ন আছে তাদের অনুপাত অনেক রকমের হতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ সিলিকেট-এ অ্যালুমিনিয়াম, আয়রণ ও ম্যাগনেসিয়াম ক্যাটায়নের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। জটিল সিলিকেট যৌগের ফর্মুলা সহজ করে লেখা যায়, যেমন $[M'_x M''_y M'''_z \cdots\cdots (SiO_3)_n]$। M' M'' M'''…হল AL, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, M_n ইত্যাদি। n-সংখ্যাটি দশ হাজার থেকে এক লক্ষও হতে পারে। n-সংখ্যাটি যত বড় হবে যৌগটির আণবিক ভরও তত বেশি হবে। সুবিধের জন্য কেবল একটি ক্যাটায়ন সম্বলিত সিলিকেট-এর ফর্মুলা লেখা যায় এইভাবে : $[Fe\ SiO_3]_n$। এখানে Fe ক্যাটায়নটি দ্বিযোজী। জল ও অক্সিজেন-এর প্রভাবে জারিত হয় নিম্নলিখিত রূপে :

$$2\,[Fe\ Si\ O_3]_n + O + 3H_2O \rightarrow 2\ [Fe\ Si\ O_3]_{n-1} + 2Fe(OH)_3 + 2SiO_2$$

$$2\,[Fe\ Si\ O_3]_{n-1} + O + 3H_2O \rightarrow 2[Fe\ Si\ O_3]_{n-2} + 2Fe\ (OH)_3 + 2SiO_2$$

পরিশেষে আয়রণ সিলিকেট সবটাই ধাপে ধাপে উল্লিখিত বিক্রিয়ার প্রভাবে $2nFe\ (OH)_3 + 2n\ SiO_2$-তে পরিণত হয়। এই প্রকার বিয়োজনের ফলে ত্রিযোজী আয়রণ হাইড্রক্সাইড এবং সিলিকা অণুগুলি শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জারণ ক্রিয়ার দ্বারা কী ভাবে জটিল সিলিকেট যৌগ ভাঙে এই বিক্রিয়াটি তারই দৃষ্টান্ত।

বিজারিত অবস্থার অথবা অক্সিজেন-এর অভাবে ফেরিক হাইড্রক্সাইড পুনরায় ফেরাস হাইড্রক্সাইড-এ পরিণত হতে পারে। যেমন, $2Fe\ (OH)_3 - O_2 \longrightarrow 2Fe\ (OH)_2 + H_2O$

সাধারণত জলাবৃত অবস্থায় অক্সিজেন-এর অভাব ঘটে এবং এই বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

যে সিলিকেট-এ একাধিক ক্যাটায়ন থাকে তা কী ভাবে ভাঙে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অর্থোক্লেজ-এর আর্দ্র বিশ্লেষণে। যেমন, $[KAL\,Si_3O_8]_n + nH_2O \rightarrow [HAL\,Si_3O_8]_n^{+}nKOH$

$$[HAL\,Si_3O_8]_n + nH_2O \rightarrow 3n\,SiO_2 + n\,Al\,(OH)_3$$

অর্থোক্লেজ-এর ফর্মুলাতে K-র বদলে যদি Ca বা Mg থাকে, যেমন পাওয়া যায় অগাইট, হর্নব্লেণ্ড কিংবা অলিভিন-এ তাহলে আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে KOH-এর জায়গায় পাব $Ca(OH)_2$ অথবা $Mg\,(OH)_2$। এই হাইড্রক্সাইড দুটি অনায়াসে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর অস্তিত্বে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট-এ পরিণত হবে। এই কার্বনেট দুটি অদ্রব সুতরাং আর্দ্র বিশ্লেষণ এবং তার সঙ্গে সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এর উৎপাদন দ্রুতগতি হবে অর্থাৎ জটিল সিলিকেট যৌগের ভাঙনও দ্রুতগতি হবে।

জৈবিক বিয়োজনের প্রভাব বহুবিধ। গাছপালার শিকড়ের প্রভাবে শিলাখণ্ড কী ভাবে ভাঙে তা আগেই বলা হয়েছে। উপরি উক্ত বিক্রিয়াদির ফলে মাটি তৈরি না হলেও চূর্ণবিচূর্ণ শিলাতে যে পরিমাণ পুষ্টি থাকে তাতেই নানাবিধ গাছপালা উৎপন্ন হতে পারে। তাদের পাতা ইত্যাদিতে যে কার্বনযৌগ থাকে তাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে অনেক-ধরনের জীবাণু সংখ্যায় বাড়তে পারে। জীবাণুদের সঙ্গে কার্বন যৌগের বিক্রিয়ার ফলে সবশেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড উল্লিখিত কার্বনেটকরণ বিক্রিয়ায় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। তাছাড়া মাঝখানে কতগুলি জৈবিক অম্লযৌগও উৎপন্ন হয়। জৈবিক অম্লের তেজ বেশি না হলেও সিলিকেট গুলিকে অনায়াসে ভাঙতে পারে। যেমন, $[MAL\,Si_3O_8]_n + nHA \rightarrow [HAL\,Si_3O_8]_n + nMA$

এখানে A হচ্ছে জৈবিক অম্লের অ্যানায়ন এবং M একটি দ্বিযোজী ধাতব ক্যাটায়ন। M দ্বিযোজীর বদলে ত্রিযোজী হলে সমীকরণটি যথারীতি বদলাবে।

জৈবিক অম্লের উপস্থিতিতে আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এবং বিয়োজনও দ্রুত হারে চলে। তা ছাড়া জৈবিক অম্লের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকার দরুন কার্বনেটকরণ বিক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। উপরন্তু জৈবিক অম্লের অ্যানায়নের উপস্থিতিতে আরো একটি বিক্রিয়া ঘটে, যার গুরুত্ব সুদূর প্রসারী। জীবাণুর সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অনেক ধরনের জৈবিক অম্ল তৈরি হয়। তার মধ্যে কতগুলি সাধারণ অণুর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু কিছু পাওয়া যায় বৃহদণুর আকারে। এই বিষয়টি পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হবে। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই আন্বিক বৃহদণুর অ্যানায়নগুলি অনায়াসে জটিল সিলিকেট-এর কোন কোন ক্যাটায়নকে (বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রণ) সাড়াশির মত বেঁধে ফেলতে পারে এবং জটিল সিলিকেট যৌগ থেকে বের করে আনতে পারে। ফলে তাদের মধ্যে দৃঢ়বন্ধন ভেঙে যায়। এই বিক্রিয়াকে বলা হয় "কিলেশন"। অতএব জীবাণুর দ্বারাও জটিল সিলিকেট যৌগগুলি পরোক্ষভাবে ভাঙা যায়। কার্বন যৌগ যথেষ্ট পরিমাণে পেলে জীবাণু সংখ্যা বাড়ে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সেই পরিমাণে ভাঙবে শিলাস্থিত জটিল সিলিকেট যৌগগুলি।

সংযোজন বিক্রিয়া

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিয়োজনের শেষ পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে সিলিকা, কেরিক এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ধাতব হাইড্রক্সাইড অথবা কার্বনেট। মাটি কি তাহলে এদের সংমিশ্রণ মাত্র? মাটি নিয়ে যে পরীক্ষা-গুলি করা হয়েছে, যেমন জল আকর্ষণ করার ও ধরে রাখার ক্ষমতা, জলের সংস্পর্শে ফেঁপে ওঠা, অল্প জলের সংস্পর্শে

আঁঠালো ভাব প্রাপ্ত হওয়া, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়োজিত যৌগগুলির মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিশ্রিত অবস্থায় একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না। অতএব বুঝতে হবে যে বিয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কী বিক্রিয়া ঘটছে যার ফলে মাটির বৈশিষ্ট্যযুক্ত পদার্থ তৈরি হচ্ছে।

স্বল্পদ্রব বিয়োজিত অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইডগুলির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটতে পারে একটি শর্তে। এই শর্তটি যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একাধিক অণুর সংমিশ্রণে একটি বা একাধিক নতুন অণু তৈরি হতে পারে যদি উৎপন্ন অণুটির (বা অণুগুলির) বিমুক্ত শক্তির (ফ্রি এনার্জি) পরিমাণ মিশ্রণের অণুগুলির অনুরূপ শক্তির যোগ-ফল থেকে কম হয়। সংমিশ্রণের ফলে যদি অন্যপ্রকার অণু (বা অণুগুলি) উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলেও ঐ একই শর্ত পালিত হতে হবে। অর্থাৎ সম্ভাব্য সব রকম বিক্রিয়ার মধ্যে যেটির বিমুক্ত শক্তি নিম্নতম সেই বিক্রিয়াটিই প্রাধান্য পাবে। তাপগতি বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের অবলম্বনে এই শর্তটি ধার্য হয়েছে। এর কোনরকম ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

সাধারণ চাপে ও তাপে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও ষোলভাগ অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে আপাত দৃষ্টিতে জল তৈরি হয় না। কিন্তু চাপ ও তাপ বাড়ালে জল (বাষ্পাকারে) তৈরি হয়। অথবা কোন অনুঘটকের (প্লাটিনাম ধাতুর গুঁড়ো) উপস্থিতিতে অল্প চাপে ও তাপে জল তৈরি সম্ভব। তাপগতিবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে জল তৈরি হতে বাধ্য। সাধারণ চাপে ও তাপে জল এত কম পরিমাণ তৈরি হয় যে তা ধরা যায় না। তা যদি না হত তা হলে উচ্চ চাপ ও তাপ কিংবা অনুঘটকের উপস্থিতিতে হতে পারত না। উচ্চ চাপ ও তাপ এবং অনুঘটকের উপস্থিতিতে জল তৈরির গতি হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায় মাত্র। জৈবিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতিহার বৃদ্ধি পায় এনজাইম-এর সহায়তায়। মাটি তৈরির কাজেও এমনি অনুঘটকের কল্পনা করা হয়েছে। সম্ভবত অসংখ্য ও নানাবিধ জীবাণুস্থিত কোন বৃহদণুর (এনজাইম-ও হতে পারে) পৃষ্ঠতল অনুঘটকের কাজ করে। হতে পারে কোন বৃহদণুর পৃষ্ঠতলে সিলিকা ধরা পড়ল। এই অবস্থায় সিলিকা অণু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অণুর দ্বারা অনায়াসে আক্রান্ত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট তৈরি করে। এইভাবে উভয় শ্রেণীর অনেকগুলি অণু পাশাপাশি আকৃষ্ট হতে পারে। তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠতল থেকে নতুন বৃহদণুটি খসে পড়ে এবং পরিশেষে কেলাসিত অবস্থায় পরিণত হয়। এইভাবে কতকগুলি মাধ্যমিক পর্যায়ের কেলাসিত মিনারেল তৈরি হতে পারে। শিলা ভাঙার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে সিলিকা সম্ভবত পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে একটি সিলিকাস্তর তৈরি করে এবং তার উপর একটি অ্যালুমিনিয়াম (অথবা আয়রণ কিংবা ম্যাগনেসিয়াম) হাইড্রক্সাইড-এর স্তর সাজানো যেতে পারে। কী অনুপাতে এই স্তর দুটি সাজানো সম্ভব তা নির্ভর করে সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এর গঠন ও আয়তনের উপর। হিসাব করে দেখা গেছে যে একটি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এর (অথবা আয়রণ কিংবা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড) উপরে ও নিচে একটি করে সিলিকার স্তর সাজানো যায় এবং যে নতুন ত্রিস্তর বৃহদণুটি তৈরি হল তা যথেষ্ট সুস্থিত। অন্যথায় একটি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এর সঙ্গে একটি মাত্র সিলিকাস্তর সাজানো যায়। এই দ্বিস্তর বৃহদণুটি ত্রিস্তর বৃহদণুটির তুলনায় অধিকতর সুস্থিত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রধানত দু ধরনের মাধ্যমিক পর্যায়ের মিনারেল পাওয়া সম্ভব। সিলিকা স্তরের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম স্তর যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 2:1 এবং 1:1 শ্রেণীর মিনারেল তৈরি হচ্ছে। ত্রিস্তর অথবা দ্বিস্তর মিনারেল হল একটি একক গঠন। বহুসংখ্যক ত্রিস্তর বা দ্বিস্তর মিনারেল একত্র হয়ে মিনারেল কণা সৃষ্টি করে। ত্রিস্তর মিনারেল-এর শ্রেণীগত পরিচয় হল স্মেক্‌টাইট। দ্বিস্তর মিনারেল-এর শ্রেণীগত পরিচয় হল কেয়োলিনাইট। এই কণাগুলির

চেহারা হবে এক একটি খুব পাতলা চাদরের মত—উচ্চতা এক কোটি সেন্টিমিটার-এর একভাগ মাত্র কিংবা তার চেয়েও ছোট। চোখে দেখতে হলে অন্তত পাঁচ থেকে দশ হাজার স্তরকে পরপর সাজাতে হবে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক সেন্টিমিটার-এর এক লাখ থেকে দশহাজার ভাগের একভাগ হবে।

স্পেক্‌টাইট অর্থাৎ 2:1 শ্রেণীর মিনারেল-এর মধ্যে বহুরকম ব্যতিক্রম সম্ভব। যেহেতু বিয়োজিত শিলার মিশ্রণে নানাবিধ অণু এক সঙ্গে বিক্রিয়া করছে, সিলিকাস্তরে কখনো কখনো চতুর্যোজী Si-এর পরিবর্তে অতি অল্পসংখ্যক ত্রিযোজী Al অনুপ্রবেশ করতে পারে, অথবা ত্রিযোজী Al-এর বদলে দ্বিযোজী Mg। গঠনের দিক থেকে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষিত হবে না কিন্তু উপরিউক্ত অনুপ্রবেশের ফলে চার্জবিহীন Si-স্তর এবং Al-স্তর উভয়ই পাবে নেগেটিভ চার্জ। এর ফলশ্রুতি এই যে একই ধরনের (এক্ষেত্রে নেগেটিভ) চার্জ হওয়ার দরুন দুটি একক ত্রিস্তর কাছাকাছি আসতে পারে না এবং আপাত দৃষ্টিতে বৃহদণু তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু ঐ মিশ্রণের মধ্যে অবস্থিত Mg, Ca, K, Na ক্যাটায়নের দ্বারা নেগেটিভ চার্জ প্রশমিত হয়ে বৃহদণু তৈরির বাধা দূর হবে। তাছাড়া হাইড্রোজেন বন্ধনীর প্রভাবে তৈরি জলের একাধিক স্তর দুটি একক ত্রিস্তরের মধ্যে প্রবেশ করে হাইড্রজেন বন্ধনীর সাহায্যে তাদের মধ্যে যোগাযোগের অতিরিক্ত ব্যবস্থাও করতে পারে। বলা বাহুল্য যে মিশ্রণস্থিত উপাদানগুলির মধ্যে পরস্পর বিক্রিয়ার ফলে একাধিক মাধ্যমিক পর্যায়ের মিনারেল তৈরি হতে পারে। কিন্তু পরিবেশ অনুসারে কোন একটি মিনারেল প্রাধান্য লাভ করে। যে স্পেক্‌টাইটে Al-স্তরে Mg-এর সর্বাধিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাকে বলা হয় মন্টমরিলনাইট। যেহেতু Al এবং Mg হাইড্রক্সাইড-এর অষ্টতলীয় গঠন একই প্রকার, Mg-এর অনুপ্রবেশ যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব। ফলে Al-স্তরের নেগেটিভ চার্জ-এর পরিমাণও বেশি হতে পারে। যে মিশ্রণে Ca-ও Mg যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান এবং পরিবেশ স্বল্প ক্ষারীয় সে ক্ষেত্রে প্রধান মিনারেল হবে মন্টমরিলনাইট। দুটি স্তরের মধ্যে জলের স্তরের অনুপ্রবেশও সহজ। ফলে তাদের মধ্যে দূরত্ব দেড়গুণেরও বেশি বাড়তে পারে। এই শ্রেণীর মিনারেল যে মাটিতে থাকে সেই মাটিই জল টেনে ফেঁপে ওঠে। শুকনো অবস্থায় সেই মাটি সঙ্কুচিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই মন্টমরিলনাইট সমৃদ্ধ মাটির প্রায়োগিক মূল্য সবচেয়ে বেশি।

2: 1 শ্রেণীর মিনারেল-এর Si-স্তরে আংশিক Al-অনুপ্রবেশের দরুন নেগেটিভ চার্জ যদি কেবল পটাসিয়াম ক্যাটায়নের দ্বারা প্রশমিত হয় তা বলে যে মিনারেল পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় মাস্কোভাইট বা মাইকা বা অভ্রজাতীয় মিনারেল। পটাসিয়াম ক্যাটায়ন দুটি একক স্তরকে এমন দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারে যে মাস্কোভাইট-এর স্তরগুলি খুব কাছাকাছি এসে যায়, ফলে তাদের মধ্যে জল প্রবেশ করতে পারে না।

যদি স্পেক্‌টাইট জাতীয় মিনারেল-এর Si-স্তরে Al-এর অনুপ্রবেশ ঘটে তা হলে Si এবং Al উভয় স্তরই নেগেটিভ চার্জ লাভ করবে। Si-স্তরের নেগেটিভ চার্জ যদি K ক্যাটায়নের দ্বারা প্রশমিত হয় তা হলে তৈরি হয় ইলাইট। জলটানার ব্যাপারে ইলাইট মন্টমরিলনাইট এবং মাস্কোভাইট-এর মাঝামাঝি। এই জন্য ইলাইটকে বলা হয় আর্দ্র মাইকা।

স্পেক্‌টাইটের Si-স্তরের নেগেটিভ চার্জ K-এর বদলে Mg ক্যাটায়নের দ্বারা প্রশমিত হলে পাওয়া যায় ভার্মিক্যুলাইট মিনারেল। যেহেতু Mg দুটি ত্রিস্তরকে K-এর মত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে না ভার্মিক্যুলাইট জল টানতে পারে, কিন্তু মন্টমরিলনাইট-এর তুলনায় কম।

কোন কোন মিনারেল-এ Al-স্তরের বদলে সম্পূর্ণরূপে Mg এবং Fe স্তর পাওয়া গেছে। তাদের যথাক্রমে বলা হয় ট্যাল্ক এবং ননট্রোনাইট। কয়েকটি মাটিতে এদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায়)

বিফল প্রতিযোগী

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পরপর তিনবার কলিংবেল টেপার পরও যখন দরজাটা খুলল না, তখন সুকুমার নিশ্চিত ধরে নিল যে, সুলেখা বাড়িতে নেই। বাপ্পাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে।

আরও একবার কলিংবেল টেপার মুহূর্তে আন্দাজমত রীনাই দরজাটা খুলল। অসময়ে ঘুমে ফুলে-ওঠা চোখ রগড়াচ্ছে।

—বৌদি কোথায় গেছে? পায়ের জুতো ছাড়তে ছাড়তে সুকুমার জিজ্ঞেস করল।

—নিচে—শম্পাদের বাড়ি।

—বাপ্পাও গেছে?

—হুঁ।···দাদাবাবু আপনাকে চা করে দিতে হবে ত?

কোনও উত্তর দিল না সুকুমার। গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যে ঢুকে পোশাক ছাড়তে লাগল। রীনা রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লুঙ্গি পরে, ঘামে ভিজে যাওয়া গেঞ্জিটা বাথরুমে কাচতে ফেলে দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সুকুমার ব্যালকনিতে পড়ে থাকা বেতের চেয়ারটায় গিয়ে বসল। এখানে এসে বসা মাত্র তার মনে হয় যে আর কলকাতায় নেই। কোনও মফস্বলে বেড়াতে এসেছে। বড় রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে বলে এই হাউসিং কমপ্লেক্সের ফ্ল্যাটগুলোতে ট্রাফিকের অনবরত যাতায়াতের আওয়াজ পৌঁছয় না। আর ব্যালকনি থেকে সোজা নজরে আসে একটা পার্ক। হাউসিং-এর লাগোয়া এই পার্ক। নানা ধরনের কিছু গাছপালা আর নিখুঁত ছাঁটা ঘাসের কার্পেট বেশ সবুজ। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর জন্যে পার্কের ভেতরে আছে কয়েকটা স্লিপ, দোলনা আর সী-শ। লতাপাতা দিয়ে তৈরি একটা জিরাফ। আর একটা হাতি। এখন রাত প্রায় আটটা বাজে। পার্কের গেট অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরে বেশ অনেকগুলো জোরালো আলোর ব্যবস্থা আছে বলে প্রায় সবটাই নজরে আসে। চোখের শুশ্রূষা হয়। সারাদিন অফিসে কলম পিষতে পিষতে ক্লান্ত মনটাও খানিক বিশ্রাম পায়। এই মুহূর্তে সুকুমার তেমন কিছু ভাবছিল না। শুধু উজল আলোয় ঝলমলে পার্কের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান দিচ্ছিল।

পায়ের শব্দে সুকুমার বুঝল রীনা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে!

—দাদাবাবু।

—কী রে?

—চা করি?···বৌদি বলেছে, ফিরতে একটু দেরি হবে। জলখাবার তৈরি করে ঢাকা দিয়ে গেছে। আপনি এলে আমাকে দিতে বলেছে···। এখন কী খাবেন?

—এখন? দাঁড়া বাবা। আগে গা-টা একটু ধুয়ে আসি। যা গরম পড়েছে! সিগারেটটা শেষ হয়ে ফিল্টারটা পুড়ছিল। মৃদু টুসকিতে সেটাকে ব্যালকনির ওপারে পাঠিয়ে দিল সুকুমার। রীনা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল—শম্পাদের বাড়ি আজ কী আছে রে?···সত্যনারায়ণ পুজো?

—নাহ্।···ওরা ভিডিও কিনেছে—জানেন ত? রীনার গলায় বেশ উৎসাহ প্রকাশ পায়।—আজকে কী একটা ভাল সিনেমা দেখাচ্ছে! অনিল কাপুর আছে! আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল। বৌদি বারণ করল।···আপনি অফিস থেকে ফিরবেন। কে চা করে দেবে?···সুকুমার রীনার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে ট্যাপটা ঘুরিয়ে কাঁকা বালতিতে জল ভরতে লাগল। ···ও, তাহলে ভিডিও-র হুজুগ! কই? সুলেখা ত আজ সকালে তাকে কিছু জানায়নি? শম্পাদের বাড়ি অর্থাৎ নিচের ফ্ল্যাটের দেবজ্যোতিবাবুদের বাড়ি যে নতুন ভি সি পি কেনা হয়েছে, —এটা সুলেখার মারফতই সে জেনেছিল কয়েক সপ্তাহ আগে। একটা বিরক্তিতে মন ভরে গেল সুকুমারের। অফিস থেকে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি ফেরার পর সুলেখা নেই, —কাজের মেয়ে রীনা তাকে চা করে দিচ্ছে,—এটা অবশ্য এই প্রথম ঘটল না। এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু বাপ্পাকেও

সিনেমা দেখতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা একেবারেই পছন্দ হয় নি সুকুমারের। পড়াশোনায় আরও মনোযোগ বেশি হওয়া উচিত বাপ্পার। গতমাসের ক্লাশ-টেস্টে সে একেবারেই সুবিধে করতে পারেনি। এখনও যদি সুলেখাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলতে হয়! অথচ ঠিকমত বলতে গেলে বাপ্পার পড়াশোনা নিয়ে সুলেখারই আদিখ্যেতা বেশি!…

গা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বসার পর রীনা চায়ের কাপ রেখে গেল টেবিলে। তার সঙ্গে জলখাবারের প্লেট। খেতে খেতে আর চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুকুমার ভাবল, রীনা তাদের তিনজনের সংসারে বেশ সেট্ করে গেছে। তিন বছর আগে বাপ্পার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন সুলেখা হঠাৎই একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল। স্বাধী চাকুরি বলা যায় না। সুলেখারই এক বন্ধু—যে ঐ স্কুলটিতে পড়াত—ব্যক্তিগত কারণে ৮ মাসের মত ছুটি নেওয়ায় সুলেখা লিভ ভেকেন্সিতে চাকরিটা পেয়েছিল। এ ব্যাপারে বন্ধুটির বদান্যতাই বেশি। কারণ সেই স্কুল-কর্তৃপক্ষকে বলে সুলেখাকে ঢুকিয়েছিল। সুকুমার খবরটা জেনে খুব একটা আগ্রহ পায় নি।

—লিভ ভেকেন্সি?…তার মানে কমাস বাদেই ত চাকরি নট…।

—ওভাবে বলছ কেন? তাই বা পায় কে? তবুও ত ক-মাস সংসারের একটু সাশ্রয় হবে। সুলেখা উত্তর দিয়েছিল।

—সে নাহয় হল। কিন্তু বাপ্পার দেখাশোনা কে করবে? ওকে স্কুলে দিয়ে আসা? নিয়ে আসা?

—আমি সাতটার সময় বেরিয়ে যাব। বাপ্পার স্কুলের বাস আটটায়। তুমি একটু বাসে তুলে দিতে পারবে না?

—সে না হয় পারলাম? কিন্তু তারপর? আমার চা খাওয়া? দশটায় ভাত পেটে গুঁজে অফিস…। এবার থেকে রান্নাবান্নাও নিজেকে করতে হবে নাকি?

—অত চিন্তার কোন কারণ নেই। গম্ভীর গলায় জানিয়েছিল সুলেখা। —সবসময়ের জন্যে একটা মেয়ে পেয়েছি। আমি না থাকলে ঐ রান্না করবে। বাপ্পারও দেখাশোনা করবে। খুব চটপটে মেয়ে…!

—তাই নাকি? বয়স কত মেয়ের?

—পনের-ষোল।

—ওরে বাবা! তাহলে ত একেবারে যৌবনের দোর-গোড়ায়! ঐ মেয়ের সঙ্গে তুমি আমাকে একা রেখে যাবে এই বাড়িতে?

—যাহ্! কী যে সব বল-না!…কপট রাগ দেখিয়ে সুলেখা সরে গিয়েছিল।

এই হল রীনার এ বাড়িতে প্রবেশ কিংবা অনুপ্রবেশের ইতিহাস। তারপর আট মাস বাদে সুলেখার স্কুলের চাকরি গেল। কিন্তু রীনা রয়েই গেল। হোলটাইমারের প্রয়োজন এই ছোট্ট সংসারে না থাকলেও, প্রায় আশি ভাগ কাজের দায়িত্ব রীণার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে স্বচ্ছন্দ রাখার এই বিলাসিতা, এই বিলাসিতার প্রলোভন সুলেখা, সুকুমারের তির্যক আপত্তি সত্ত্বেও, এড়িয়ে যেতে পারল না। এবং সেই থেকে এই সংসার হয়ে গেল চারজনের।

—দাদাবাবু, আর কিছু লাগবে? শূন্য প্লেট আর শূন্য কাপের সামনে জবুথবু বসে থাকা সুকুমার রীনার ঐ প্রশ্নে তার দিকে তাকাল।

—নাহ্। এগুলো নিয়ে যা।…

রীনা টেবিল থেকে কাপ-ডিশ-প্লেট সরাতে লাগল।

—ওরা কখন আসবে রে?

—সিনেমা ত এতক্ষণ শেষ হয়ে যাবার কথা। দেখে আসব?

—যাবি? এই সামান্য প্রশ্নটাতে সুকুমার যেন বেশ ভাবিত হয়ে পড়ে। একটু ঝুঁকে, টেবিলের ও-পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয়। ধীরেসুস্থে, সময় নিয়ে একটা ধরায়। ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকায়। প্রায় নটা বাজে! সিনেমায় এত বুঁদ হয়ে গেছে যে বাড়ি ফেরার কথা সুলেখার বোধহয় আর মনে নেই। এটা যথেষ্ট বাড়াবাড়ি! সুকুমার রীনার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল—আর ডাকতে যেতে হবে না। আসবেখন।…

রীনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মিনিট দুই পরেই অবশ্য কলিংবেল বাজল।

রীনা দরজা খোলে।

—দাদাবাবু ফিরেছে? সুলেখার জিজ্ঞাসা।

—অনেকক্ষণ।…চা খাওয়া হয়ে গেছে।

সুকুমারের অনুমান মতই সুলেখা সরাসরি এ ঘরে আসে না। বাথরুমে যায়। বাপ্পা ঘরে ঢুকলেই সুকুমার কঠিন গলায় বলে—খুব হুজুগ চলছে?…এ্যাঁ?…

—কাল তো শনিবার। স্কুল ছুটি। বাপ্পা উত্তর দেয়।

—তাই বলে পড়াশোনার পাট তুলে দিতে হবে?

—একটা দিন ত বাবা? শম্পাদের বাড়ি ভিডিও-তে

একটা দারুণ হিন্দি ছবি দেখাল! খুব ডিম্বম ডিম্বম আছে! উল্লাসে বাপ্পার চোখগুলো কাচের গুলির মত চকচক করে।

—ঐ ডিম্বম ডিম্বম করলেই পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া যাবে? আর পড়াশোনা করতে হবে না? একটু উঁচু গলাতেই কথাটা বলে সুকুমার। সুলেখাকে শুনিয়ে। কেননা পর-মুহূর্তেই সুলেখা ঘরে ঢোকে। এবং জিজ্ঞেস করে—কী হল কী? গজগজ করছ কেন?

সুলেখার পায়ের পাতায় জল। আঙুলেও। সুকুমার একবার তাকিয়েই বুঝে যায় বেশ তোফা সেজেছে তার বউ। স্লিভলেশ ব্লাউজের সঙ্গে মানানসই জমকাল শাড়ি। ঠোঁটে পুরু লিপস্টিক। চূড়ো করে বিচিত্র ধরনে চুল বাঁধা। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সুকুমার বলল—সিনেমা দেখতে চাও নিজে গেলেই হয়। কিন্তু বাপ্পাকে নিয়ে যাওয়া কেন? ঐসব থার্ড ক্লাশ হিন্দি ফিল্ম দেখে ওর কী উপকারটা হয়?

—রোজ ত আর যাচ্ছে না? খুব বায়না করছিল, তাই নিয়ে গেলাম। জানো ত?…মোলায়েম গলায় সুলেখা জানায়—দেবজ্যোতিবাবুর মিসেস এই হাউসিং-এর প্রতি বাড়িতে গিয়ে নেমতন্ন করে এসেছিলেন। ড্রয়িং-রুম লোকে ভরে গিয়েছিল। সব বউগুলোই প্রায় এসেছিল। আসলে ওঁরা নিজেদের ভিসিপি আছে এ ব্যাপারে একটা দারুণ পাবলিসিটি দিলেন?

—তার মানে—এরকম জগঝম্প ঐ বাড়িতে এখন প্রায়ই চলবে?

—চলবে কিনা জানিনা। তবে ভিসিপি যাদের আছে তারা ইচ্ছে করলে বাড়িতে লোক ডাকতেই পারে। ওদের মতিগতি আমি ত ঠিক বলতে পারব না। আমার ত আর ভিসিপি নেই!

সুকুমার সতর্ক হয়ে যায়। গুম হয়ে বসে থাকে। এখন উত্তর করলেই সুলেখার সঙ্গে একটা ঝগড়া পাকিয়ে যেতে পারে। 'আমার ত আর ভিসিপি নেই'—এই কথা বলে সুলেখা হয়ত সেই ঝগড়ারই সূচনা করতে চাইছে।…

* * * *

দেবজ্যোতিবাবু…দেবজ্যোতি ঘোষ? এই যেন এক শনি লেগেছে সুকুমারের পেছনে? প্রায় বছরখানেক হল লোকটি সুকুমারের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটে এসে জুটেছে। ইদানীং যেরকম হয়। ছোট্ট সংসার লোকটার। স্ত্রী আর এক মেয়ে। একেবারে মেপে পা ফেলা দেবজ্যোতিবাবুর। সুকুমারের প্রতিবেশী হওয়ার পর থেকেই ও বাড়ির অনেক-রকম কথাই সুলেখা মারফত কানে আসতে লাগল। অফিস থেকে ফিরে সুকুমার সাধারণত বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে, জমজমাট থ্রিলারের পাতায় ডুবে থাকে। পাশের ঘরে টিউটর বাপ্পাকে পড়ায়। আর সুলেখা গুটি গুটি এসে বসবে খাটের একধারে। পাখার স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে একথা-সেকথা বলতে শুরু করবে। বেশির ভাগই পাড়া-প্রতিবেশীর খবর। এ ব্যাপারে গেজেটিয়ার হওয়ার একটা প্রবণতা সুলেখার বোধহয় ছিল। এই আবাসন-জীবনের ঘূর্ণিতে তা আরও বেড়েছে। কত সব খবর যে রাখে সুলেখা! 'ডি' ব্লকের মি. বোস আজ তিনদিন জ্বরে শয্যাশায়ী। তার ওপর মেড-সারভেন্ট কামাই করছে। ফলে বাজার দোকান ডাক্তারখানা এবং বাসনমাজা নিয়ে মিসেস বোসের একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা। মিসেস পাকড়াশী বরাবর নিজের ছেলের ব্রিলিয়ান্স সম্বন্ধে সাতকাহন করে শোনাতেন সবাইকে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঐ ছেলেটি একেবারেই ভাল রেজাল্ট করেনি। ফলে মিসেস পাকড়াশী বিকেলে পার্কে মহিলাদের মজ্‌লিশ অ্যাটেণ্ড করা বন্ধ করেছেন। 'সি' ব্লকের একতলায় যে নতুন দম্পতি এসেছে, তাদের মধ্যে নাকি মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। তুমুল ঝগড়ার পর বউটি কয়েকদিন হল বাপের বাড়ি গেছে। এখনও ফেরেনি। এ ধরনের কত খবর? সাধারণত, সুকুমার এসব ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামায় না। সুলেখা শুধু বলে যায়। আর সুকুমার হাতের বই বন্ধ করে শোনার ভানসহ সুলেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে—'তাই নাকি?'—'বটে?—'কী বলছ তুমি'—এ ধরনের কয়েকটি কথা ছুঁড়ে দিয়ে সুলেখাকে উৎসাহিত করে। কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা সুলেখার কথা সুকুমারের মনোযোগ সত্যিই আকর্ষণ করল।

—আমাদের ঠিক নিচের ফ্লাটে যারা ভাড়া এসেছে… ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে? প্রশ্নটা করেছিল সুলেখা।

—কাদের কথা বল ত? সুকুমার প্রথমে ধরতে পারে না।

—ঐ যে—? দেবজ্যোতিবাবুরা?

—ও…হ্যাঁ, হ্যাঁ। নাহ, আলাপ আর হল কই?

—ঐ ভদ্রলোক কোন্ অফিসে চাকরি করেন জানো?

—কী করে জানব? এখনও আলাপই হল না? কিন্তু তোমার হঠাৎ এত কৌতূহল?

—গতকাল বিকেলে আমরা কয়েকজন ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ জমাতে ওনার বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ি ঘর যা কারনিসড দেখলাম। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অনেক টাকা মাইনের চাকরি করেন।

সুকুমার যে টাইপের কোয়ার্টারে থাকে, সেই একইরকম কোয়ার্টার যখন দেবজ্যোতিবাবুর ভাগ্যেও জুটেছে, তখন খুব একটা উঁচু চাকরি কি ভদ্রলোক করেন? এক মুহূর্ত সুকুমার ভাবে। কিন্তু ভাবনাটা প্রকাশ না করে সুলেখার কাছে একটা নিরীহ প্রশ্ন রাখে—

—কেন? কীরকম দেখলে?

—বাড়ির ভেতরে যাবার সুযোগ হয়নি। শুধুমাত্র ড্রয়িংরুমে বসেছিলাম। কিন্তু ড্রয়িংরুমটাই যা দেখলাম! ···মেঝেতে দামী কার্পেট, জানলা এবং দরজায় কস্টলি পর্দা, কালার টিভি, সোফা সেট—সব রকমই আছে।···

সুকুমার চুপ করে শোনে। এবং বুঝতে পারে যে, সুলেখার প্রতিটি বাক্য থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঈর্ষা ঝরে পড়ছে। বস্তুত সুলেখার অবাক কিংবা কৌতূহলী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। লো-ইনকাম-গ্রুপের আবাসন এটা। সরকারি কেরানি এবং ছোট মাপের অফিসারদের বাস এখানে। জীবনযাত্রার মান এখানে নিচু তারে বাঁধা। যে কোন ফ্লাটেই—ড্রয়িংরুমে কার্পেট, জানলায় দামী পর্দা এবং কালার টিভি—এসব দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং, স্বাভাবিক কারণেই, দেবজ্যোতিবাবুদের ড্রয়িংরুম সম্বন্ধে সুকুমারের মনে একটা কৌতূহল থেকেই গেল।

এবং একদিন আলাপের সুযোগও হয়ে গেল। অফিস যাবার জন্যে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে সুকুমার একটা গোলমালের খবর পেল। কোথায় নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে জোর হাঙ্গামা হয়েছে। রাস্তাঘাট অবরোধ। যান বাহনও বন্ধ। তাহলে অফিস কামাই করবে নাকি? ট্যাক্সিও দেখা যাচ্ছে না। হেঁটে অফিস যাওয়া অসম্ভব। পৌঁছতে পৌঁছতে একটা বেজে যাবে। গলদঘর্ম সুকুমারকে দেখে শুভব্রত, রমেন এবং অন্যান্যরা এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলবে—এত কষ্ট করে কী দরকার ছিল আসার? ছুটি নিলেই পারতে। দুপুরটা বউ-এর সান্নিধ্যে ভালই কাটত···সুতরাং ঘণ্টাখানেক স্ট্যাণ্ডের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে পরপর কয়েকটা সিগারেট ধ্বংস করার পর সুকুমার বাড়ি ফিরে যাওয়াই মনস্থ করল। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল দেবজ্যোতি। এক ব্লকের বাসিন্দা হওয়ায় বাজার যাওয়া-আসার রাস্তায় মুখচেনা ছিলই। বেশ ফর্সা, লম্বা এবং ছিপছিপে চেহারা। জিনসের প্যাণ্ট এবং একটা বটল-গ্রীণ তোয়ালে গেঞ্জি। চোখের দৃষ্টিতে চালাকির বিদ্যুৎ। একটু হেসে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল—ফিরে যাচ্ছেন?···সত্যি, কী অরাজকতাই না শুরু হয়েছে?

—হ্যাঁ, এসব ত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সুকুমার নিস্পৃহ গলায় বলল।

—কথায় কথায় এরকম অবরোধ হলে চলে মশাই? আজ আমার অফিসে যাওয়া খুবই জরুরি ছিল।

—আপনি কোন্ অফিসে আছেন? যেন মুখ ফসকেই জিজ্ঞাসাটা বেরিয়ে যায়।

—আমি?···একটু হাসে দেবজ্যোতি। গর্বের হাসি কি?···এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট।···ইনস্পেক্টর···।

—বাহ্ বেশ বেশ।

—আপনি কোন্ অফিসে? দেবজ্যোতি প্রশ্ন করে। সুকুমার নিজের অফিসের নাম বলে।

···তাহলে সুলেখার আন্দাজ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। দেবজ্যোতির হাতে টাকা-পয়সার আমদানী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সুকুমার শুনেছে ঐ দপ্তরে নাকি টাকা উড়ে বেড়ায়। শুধু মুঠো করে ধরতে পারলেই হল।

—সেই যখন অফিসে যাওয়া হল না।···চলুন একটু আড্ডা মারা যাক্। দেবজ্যোতিই প্রস্তাবটা দেয়।

—আড্ডা···! কোথায়?···

—যে কোন জায়গাতেই হতে পারে। আমার ফ্লাট। কিংবা আপনার।···আমার ওখানেই চলুন···।

কথাটা বলেই দেবজ্যোতি হাঁটতে থাকে। এবং সুকুমারও তার পেছন পেছন। হাঁটতে হাঁটতে সুকুমার ভাবে, বরাত খুব ভাল বলতে হবে যে, বাপ্পার একটু জ্বর-জ্বর হওয়ায় আজ স্কুলে যায়নি। নাহলে বাপ্পার বাড়ি ফেরা নিয়ে একটা চিন্তা থেকে যেত।

তিনতলায় নিজের ফ্লাটের সামনে এসে কলিংবেল টিপল দেবজ্যোতি। এ বাড়িতেও বোধহয় একজন হোলটাইমার মেয়ে আছে। সেই দরজা খুলল।

—আসুন···আসুন। দেবজ্যোতির পেছনে সুকুমার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার পায়ের চটি ডুবে গেল নরম কার্পেটে! এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে তার মনে হল, হ্যাঁ,

সুলেখা ঠিকই বলেছে। ঘরটা যাকে বলে,—ওয়েল-ফারনিশড্। পর্দা কালার টিভি এসব ত আছেই। এমনকি টিভিটা যে স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা আছে সেটাও যথেষ্ট সুন্দর। ওটা যে খাঁটি সেগুন কাঠের,—তা বস্তুটার মসৃণতা ও পালিশ দেখলেই অনুমান করে নেওয়া যায়। সামনে সেণ্টার টেবিলটাও অনিবার্যভাবে সেগুনের। ঘরের এককোণে একটা গোল পেতলের ভাসে রজনীগন্ধার স্টিক্। সোফার গদিতে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সুকুমার। মাথার ওপর চকোলেট রঙের ঝাঁ-চকচকে ঘূরন্ত ফ্যান। বাড়ির ভেতর থেকে দেবজ্যোতি আবার ড্রয়িংরুমে ফিরে আসে। এবার পেছনে তার স্ত্রী।

—এই যে—ওনাকে ধরে নিয়ে এলাম।

—নমস্কার। ভদ্রমহিলা হাত-জোড় করলে সুকুমারও হাত-জোড় করে।—আপনার মিসেসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

—হ্যাঁ, জানি। সিগারেটটা অ্যাশট্রের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সুকুমার উত্তর দেয়।

—এখানে আমাদের লেডিস্ ক্লাবটা বেশ ভাল। প্রতি সপ্তাহে এক একজনের ফ্লাটে আড্ডা বসে।

—ওহ, আপনিও ঐ ক্লাবে ঢুকে গেছেন?

—আর কী করব? সময় কাটাবার জন্যে একটা কিছু ত করতে হবে।···বসুন চা নিয়ে আসি···। মিসেস ঘোষ বেরিয়ে গেলেন।

—লেডিস ক্লাব আছে। কিন্তু জেণ্টস ক্লাব ত নেই। দেবজ্যোতি সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে। সুকুমার কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেট টানে।

—এর আগে ত আমি জেলা-অফিসে ছিলাম। জেলার লাইফ আর কলকাতার লাইফ অনেক তফাত মশাই?··· এখানে যেন সবাই কীরকম সেল্ফ-সেণ্টারড্? কারোর সঙ্গে কারোর ইনটিমেসি হয় না।···

—কোন্ জেলায় ছিলেন?

—জলপাইগুড়ি। আমার বাড়িও নর্থ বেঙ্গলে। কুচবিহার।

—তাই? সুকুমার আলোচনা চালাবার জন্যে প্রসঙ্গ খোঁজে। ইতিমধ্যে মিসেস ঘোষ চা দিয়ে যায়। সুদৃশ্য প্লেটে ক্রিম-বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, পা নাচাতে নাচাতে দেবজ্যোতি বলে—জলপাইগুড়িতে প্রায় বছর দশেক যে বাড়িটাতে ভাড়া ছিলাম সেটা এই ফ্লাটটার থেকে অনেক বড় ছিল। তিনটে লিভিং-রুম। একটা বড় ডাইনিং স্পেস। দুটো টয়লেট।···আর এই ফ্লাটটা ঠিক একটা কৌটোর মত। আমার সব জিনিসপত্র রাখতে যা অসুবিধে হচ্ছে না? ···অবশ্য কলকাতায় বেশিদিন থাকতে আসি নি।

—এবার কোথায় যাবেন?

—জলপাইগুড়িতেই আবার ফিরে যাব। কুচবিহার হোম-ডিস্ট্রিক্ট হলেও জলপাইগুড়ি আমাদের দুজনেরই ফেভারিট। তাছাড়া ওখানে কয়েক কাঠা জমিও কিনে রেখেছি। প্ল্যানও সেটলড্। এবার মনের মত একটা বাড়ি তৈরিতে হাত দেব···।

—বাহ্, বেশ মেথডিক্যাল ফ্যামিলি-ম্যান ত আপনি?

—হাঃ, হাঃ, হাঃ···এবার দেবজ্যোতি আত্মতুষ্টির হাসি হাসে। তারপর বলে—কিন্তু এতক্ষণ ত শুধু সেলফ-পাবলিসিটি করে গেলাম। আপনার কথা ত কিছুই শোনা হল না।

—শোনার মতো আর কী আছে?···ছাপোষা, গেরস্থ লোক।··· কোনভাবে টিঁকে আছি। আপনার মত অতটা গুছিয়ে উঠতে পারিনি এখনও। উত্তরে দেবজ্যোতি শুধু অল্প হাসে। তারপর প্রসঙ্গ পালটে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—আর এক কাপ চা হবে নাকি?

—নাহ্। ধন্যবাদ। এবার উঠি।

—ও কে।

—একদিন আমার বাড়িতে পদধূলি দিন?

—হে···হে···হে···কী যে বলেন? যাবখন একদিন। দরজা বন্ধ হয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুকুমারের মনে হয়, এক্সাইজ দপ্তরের একজন ইনস্পেকটর কত টাকা মাইনে পায়? তার পক্ষে দেবজ্যোতিবাবুর স্টাইলে কি থাকা সম্ভব?···তাহলে?

* * *

দেবজ্যোতিকে প্রতিবেশী পেয়ে ক্রমশঃ সুকুমারের একধরনের সমস্যা শুরু হল। সুলেখার সঙ্গে কথাবার্তায় ওদের প্রসঙ্গ এসে পড়তে লাগল বারবার।

—জানো ত, সেদিন মিসেস ঘোষকে জিজ্ঞেস করলাম—কার্পেটটার দাম কত?

—কার্পেট? রেফারেন্সটা সুকুমার প্রথমে ধরতে পারে নি।

—ঐ দেবজ্যোতিবাবুদের বাড়ি?

—আচ্ছা, আচ্ছা।···কত দাম?

—প্রায় পনের শ।

—অনেক দাম। সুকুমার বলল।

—কাগজে সেদিন বিজ্ঞাপন দেখছিলাম,—লিণ্ডসে স্ট্রিটের কয়েকটা দোকানে বেশ সস্তায় কার্পেট বিক্রি হচ্ছে। সাত আটশ টাকার মধ্যে।···একদিন দেখতে যাবে?

সুলেখা প্রশ্নটা করার পর সুকুমার বেশ কিছুক্ষণ কোন উত্তর দেয় না। এবং তার এই নীরবতায় বিরক্ত হয়েই বোধহয় সুলেখা একটু রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করে—কথাটা কানে গেল না বুঝি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গেছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি বলে। তারপর সুলেখার দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে—ত হঠাৎ কার্পেট কেনার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

—ব্যস্ততার কী দেখলে? সুলেখার গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ ফুটে ওঠে। —শুধু অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস, —এছাড়া তোমার আছেটা কী? ঘরদোর সাজাবার কথা কখনও ভেবেছ? বাইরের ঘরে একটা কার্পেট পাতলে দেখবে ঘরের চেহারাটাই পাল্টে যাবে।

—তা হয়ত পাল্টে যাবে।···কিন্তু তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তোমাকে বাড়ির আরও অনেক জিনিসই পাল্টাতে হবে।···যেমন আমাদের পোর্টেবল টিভিটা একটা নড়বড়ে কেরোসিন কাঠের টেবিলে রাখা আছে। ওটাকে বাতিল করে একটা ভাল টিভি-স্ট্যাণ্ড কেনা উচিত। জানলায় গত তিন বছর ধরে টাঙানো রঙ জলে যাওয়া সস্তা পর্দাগুলো চেঞ্জ করতে হবে। বাইরের ঘরে যে আলনাটা কাপড়-চোপড় ডাঁই করা থাকে সেটা সরিয়ে—

—থাক থাক হয়েছে। অত ফিরিস্তি দেবার কী আছে? তোমাকে আমি চিনি না। সোজা ব্যাপারকে জটিল করায় তোমার থেকে দড় আর কে আছে? এবার সুকুমার একটু মোলায়েম গলায় বউ-কে বোঝাতে চায়।—আসলে কী জানো ত?···কার্পেট আমাদের কাছে ইনডিসপেনসেবল্ নয়! ইনকাম বলতে ত শুধুই আমার মাস-মাইনে। তুমি খুব ভালই জানো। একেবারে টাইট বাজেটের ওপরে চলতে হয়!···

—থাক, থাক, হয়েছে! ওসব কোন কারণ নয়। আসলে তুমি হচ্ছ কুয়োর ব্যাঙ! অবস্থার পরিবর্তনের কথা কোনদিনই ভাবো না!···

সুলেখার মুখ থেকে ছিটকে আসা এ-ধরনের একটা উপমার জন্যে সুকুমার প্রস্তুত ছিল না। রাগ সামলে নিতে তার প্রায় আধমিনিট সময় লাগল। ততক্ষণে সুলেখা সামনে থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেছে।

মাস ছয় বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা আচমকাই আয়েস-গিরি ফেটে বিস্ফোরণ হল। অফিস থেকে ফিরে সুকুমার চা নিয়ে ব্যালকনিতে বসে পার্কের আলো দেখছে। সুলেখা একটা মোড়া টেনে নিয়ে পাশে এসে বসল। তারও হাতে চায়ের কাপ। আজকাল নিরিবিলিতে সুলেখা এরকম পাশে এসে বসলেই সুকুমারের আনন্দের বদলে অস্বস্তি হয়। আবার কোন্ কথার সূত্র ধরে কী ঝামেলা বেধে যায়! এরকম সময়ে সে বাপ্পাকে মধ্যিখানে ডেকে নেয়। কৌশলে ডেকে নেয়। এবং বাপ্পা এসে বকরবকর শুরু করলে সুকুমার মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাপ্পা টিউটরের কাছে পড়াশোনায় ব্যস্ত। সুতরাং···সুতরাং ···যেন অস্বস্তিকর নৈঃশব্দের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই সুকুমার হঠাৎই লঘু গলায় বলে—আজ খুব সাজগোজ হয়েছে, দেখছি?

—চোখে পড়েছে তাহলে?

—কী যে বলো? এত সাজলে চোখে পড়বে না? বয়স বাড়লেও শরীরকে ত ভালই ধরে রেখেছ! এখনও রাস্তায় বেরোলে—

—থাক। থাক। হয়েছে।···ওসব ফ্লাটারি অফিসের স্টেনোকে কোরো। লাভ আছে। সুলেখার গলা শুনেই সুকুমার বোঝে যে সে খুশী হয়েছে।

—আজ সাজগোজ করবার উপলক্ষটা কী? আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি নাকি?

—ঐ দিনটা অবশ্য তোমার কোনবারেই মনে পড়ে না। নাহ্, আজ ওসব কিছুই নয়। বুধবার···লেডিস ক্লাব ছিল।

—কাদের ফ্লাটে ক্লাব হল আজ?

—দেবজ্যোতিবাবুদের ফ্লাটে···।

—তাই নাকি? সুকুমার ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায়। ঐ বাড়ির প্রসঙ্গ উঠলেই সে সতর্ক হয়ে যায়।

—মিসেস ঘোষের একটা কমেণ্ট বড় কানে লাগল! সুলেখার এই কথায় সুকুমার ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতূহল কিংবা প্রতিক্রিয়া কোনটাই তার হয় না। ফলে পরবর্তী কথায় পৌঁছতে সুলেখার একটু অস্বস্তি হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুলেখা বলে—এবার বোধহয় আমাদের একটা কালার টি ভি কেনা উচিত?

—তা ত উচিতই। নিস্পৃহ গলা সুকুমারের।

—তাহলে কেনাই যাক।···আট বছর আগে ঐ পোর্টেবল টিভিটা কেনা হয়েছিল। এখন আর একেবারে ঘরে মানায় না! মিসেস ঘোষ ত কথায় কথায় শুনিয়ে দিলেন···

—কী শোনালেন?

—সকলের সামনে হঠাৎ আমায় বললেন—আপনারা ভাই পোর্টেবল টি ভি এখনও কীভাবে দেখেন? ছবি এত ছোট দেখায়?···খুব খারাপ লেগেছে আমার। কিনতে হয় ত একেবারে একটা কালার টিভিই কিনব। নাহলে এই অপমানের জবাব দেওয়া যাবে না!

—অপমানটা তোমার।···আমার নয়।

—মানে?

—আমার সামর্থ্য কতটুকু জানো না? বিলাসিতা করে টাকা উড়িয়ে লোকের বাহবা আদায় করার মত টাকা আমার নেই। মাইনে পেয়ে ত আর নিজে ওড়াই না! তোমার হাতেই তুলে দিই! সংসারের খরচ সামলে কটা পয়সা বাঁচে? উপরি আয় না থাকলে ওসব নবাবী করা যায় না। কেরানির বউ-এর অত আবদার ভাল না।

—আবদার?···তোমার কাছে এতদিন কী আবদার করেছি আমি?···সুলেখা এত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে যে পাশের ঘর থেকে বাপ্পা ছুটে ব্যালকনিতে এসে মা-বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর টিউটর কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছে। ব্যালকনির অল্প আলোয় সুকুমার লক্ষ করে—সুলেখার ফর্সা মুখ রাগে দপ্‌দপ্ করছে। সেই মুহূর্তেও সুকুমারের উপস্থিত বুদ্ধি ভালই কাজ করে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সুলেখাকে এভাবে চেঁচাবার সুযোগ দিলে আশে-পাশের ফ্লাটের জানলায় এখুনি কিছু কৌতূহলী মুখ উঁকি-ঝুঁকি দেবে। বাতাসে খবর রটে যাবে যে, সুকুমারদের ফ্লাটে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে। অনেকের কাছে বেশ মুখরোচক খবর হবে এটা। তাই সুকুমার ঘরে ঢুকে পড়ে। ফলে সুলেখাও ঘরে ঢুকতে বাধ্য হয়।

সুকুমার সুলেখাকে শান্ত করার জন্যে বলে—ওরকম চেঁচাচ্ছ কেন? অযৌক্তিক কিছু ত বলিনি?

—আবদারের কথা বললে কেন? সুলেখার গলার পর্দা আরও এক ধাপ বোধহয় ওঠে।—এতকাল বিয়ে হয়েছে—কোন্ আবদারটা করেছি তোমার কাছে?··কোনদিকেই তোমার নজর নেই। সব সময় শুধু হিসেব আর হিসেব। তোমার চলতে পারে? আমার চলবে না? এভাবে মুখ দেখানোও অসম্ভব হয়ে পড়ছে!···

—সত যদি কেনাকাটার শখ,—লোকের সঙ্গে পাল্লা দেবার শখ,—তাহলে বাবার কাছ থেকে টাকা এনে করগে যাও? কেউ যদি ঘুষ খায়, ঘুষের টাকায় ঘরবাড়ি সাজায়, তাহলে আমাকেও তাই করতে হবে? আমার কোন নীতি-বোধ নেই? এবার সুকুমারও নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। চেঁচিয়ে ওঠে। এ তার অনেকদিনের ক্রোধ। বুকের মধ্যে জমে থাকা ক্রোধ আর আক্ষেপ।

কিন্তু সুলেখাও যেন আজ হিংস্র হয়ে উঠেছে। লুকিয়ে রাখা বাঘনখ সেও যেন আজ বের করতে চায়! সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তোমার নীতিবোধ আমার খুব জানা আছে! অত যদি নীতিবোধ, তাহলে বিয়ের সময় হাত পেতে আমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে কেন?···ঐ পোর্টেবল টিভি, ওটাও ত আমার বাবার টাকায় কেনা—তাই না? সুলেখা চেঁচাতে থাকে।···চেঁচাতেই থাকে।

স্তম্ভিত সুকুমার তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুলেখার মনে যে এত প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা সে এতদিন বোঝেনি।··আজ বুঝছে।···কয়েক মুহূর্ত বাদে অনিবার্য-ভাবেই সুলেখা কাঁদতে শুরু করে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাপ্পা অবাক চোখে একবার মা আর একবার বাবার দিকে তাকায়!···

এখন গভীর রাত। আশেপাশের সমস্ত ফ্লাটে আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে সুকুমার চুপচাপ ব্যালকনিতে বসে আছে। কানের কাছে মশার বিরক্তিকর ভন্‌ভনানি। আবহাওয়ায় একটা গুমোট ভাব। হাওয়া বইছে না এতটুকু। ঘুমন্ত বাপ্পার পাশে সুলেখা শুয়ে আছে খাটে। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে?···খুবই খারাপ লাগে সুকুমারের। সামান্য কয়েকটা কথা থেকে একটা বিশ্রি ঝগড়া হয়ে গেল। এরকম ঝগড়া সে ত চায়নি? বরং সে কয়েকটা কথা সুলেখাকে বোঝাতে চেয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল যে আমরা আমাদের মত থাকি। অন্যেরা অন্যদের মত থাকুক। যার যে রকম সামর্থ্য, সে সেরকমভাবে জীবনকে উপভোগ করবে। কী হবে প্রতিযোগিতার মধ্যে গিয়ে?···ওতে শুধু আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, যন্ত্রণাও বাড়ে হয়ত, কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু এসব কোনকিছুই সে প্রকাশ করতে পারল

না সুলেখার কাছে। পারলেও সুলেখা কী বুঝত তাকে? প্রতিযোগিতার বাইরে থাকতে পারার যে আনন্দ তা কি সুলেখা পেয়েছে কোনদিন?···আদৌ পাবে?···

* * * *

কয়েকদিন ভাবনাচিন্তার পর সুকুমার অফিস থেকে লোন্ নেবে ঠিক করল। অনেক ভেবে সে বুঝেছে, অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। মিসেস ঘোষের কাছে সুলেখার প্রেস্টিজ বাঁচাতে অন্তত একটা রঙিন টিভি কিনে ফেলাই উচিত। আর সত্যিই ত! এটা কী সুলেখার খুব বিশাল কোন চাহিদা? রঙিন টিভি খুব একটা দুর্লভ বস্তু এখন আর নয়। সহকর্মীদের অনেকের বাড়িতেই ওটা আছে। গত বছর পে-স্কেল বাড়ার কারণে এরিয়ারের যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে নিজের সেভিংস থেকে কিছু অ্যাড করে একটা রঙিন টিভি কেনা চলত। অফিসের কয়েকজন কলিগ ত তাই করেছিল। সুকুমারও একবার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিল সুলেখার সঙ্গে। কিন্তু সুলেখাই তখন প্রস্তাব দিয়েছিল, টিভি-র পেছনে হঠাৎ অত টাকা ইনভেস্ট না করে, এরিয়ারের অ্যামাউন্ট বরং ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখে দেওয়া যায়। তাই করেছিল সুকুমার। কিন্তু এখন,—প্রতিবেশীর সঙ্গে স্ট্যাটাসের প্রতিযোগিতায় নেমে সুলেখার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে সুকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।···

পাড়ায় যে বড় টিভি-র দোকান আছে, সেখানে দোকানদার ছোকরাটি সুকুমারের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করল। সিগারেট অফার ত করলই। চা-ও খাওয়াল। এবং সুকুমারকে কথা দিল যে, তার পুরনো, পোর্টেবলটা সে বিক্রি করার ব্যবস্থা করবে এবং সেই দাম রঙিন টিভির দামের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে।

পরের দিন অফিসে ঢুকেই সুকুমার অ্যাকাউন্টস্ সেকশনে খোঁজ নিল। তার লোনটা কি আজ পাওয়া যাবে? মুরারিবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন—পাবেন, পাবেন।···খুব তাড়াহুড়ো দেখছি মশাই? কী ব্যাপার বলুন ত? জমি-টমি বুক করেছেন কোথাও?

—যাহোক একটা কিছু ভেবে নিন।—সুকুমারের এরকম অস্পষ্ট উত্তরে মুরারিবাবু স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন। গলার স্বর পালটে বললন—আজ যদি পেমেন্ট পেতে চান,—দুটোর মধ্যে ক্যাশ কাউন্টারে রেভিনিউ স্ট্যাম্প হাতে নিয়ে চলে যাবেন।···

দুটো নয়। একটু তদ্বির করে সে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে একটা নাগাদ চেকটা পেল। ফলে অফিসের নিচের ফ্লোরে ব্যাঙ্ক থেকে চেকটা ক্যাশ করে নিতে অসুবিধে হল না। দশ হাজার টাকা? এত টাকা পকেটে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করা আজকাল বিপজ্জনক। সুকুমার ভাবল আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোবে। বাসে ফিরবে না। ট্যাক্সিতে। ভিড় বাসে পকেটমারের পাল্লায় পড়লে আর আপশোসের সীমা থাকবে না। তিনটে বাজতে তখনও কিছু বাকি। সুকুমার একটা ফাইল মন দিয়ে পড়ছিল। এমন সময় দেবু এসে হাজির। দেবকুমার। সুকুমারের ছোট ভাই। একটা প্রাইভেট কোম্পানির স্টেনোগ্রাফার। হাওড়ার দিকে দুটো ঘরের একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। দেবুর সঙ্গেই থাকে মা। যে কোন কারণেই হোক, মা সুকুমারের কাছে কালেভদ্রে এলেও, দেবুর সঙ্গেই থাকা মনস্থ করেছেন। দেবুকে দেখেই একটা অস্বস্তি হল সুকুমারের। প্রায় দেড় মাস হবে, মায়ের কোন খোঁজ রাখা সম্ভব হয়নি সুকুমারের পাশে। গত বছর জুন মাস নাগাদ মায়ের প্রেশারটা হঠাৎই খুব বাড়ায় সুকুমার ক্যামিলি নিয়ে চলে গিয়েছিল দেবুর বাড়ি। সারাদিন ছিল। ডাক্তারের পেছনে ছোটাছুটি করেছিল। এবং চিকিৎসা বাবদ কিছু টাকা সাহায্যও দিয়েছিল দেবুকে। সে যাত্রা সামলে নিলেন মা। সুকুমার সপ্তাহে অন্তত একবার অফিস-ফেরতা মায়ের খোঁজ নিতে যেত। কিন্তু গত দেড় মাস সেটা করা হয়নি। দেবুর দিকে তাকাল সুকুমার। কীরকম ঝড়ে বিধ্বস্ত কাকের মত লাগছে। গালে বাসি দাড়ি। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ।

—কী রে?···তুই হঠাৎ?···মা কেমন?

—মা ঠিকই আছেন।···ওসব ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।···দেবু থেমে গেল। তারপর বলল—একটু চা বলো ত দাদা। সকাল থেকে শুধু ঘুরছি।

পিয়নকে দু-কাপ চা আনতে বলে সুকুমার সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? খুব দুশ্চিন্তায় আছিস মনে হচ্ছে!

—ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।

—কেন রে? তৃপ্তির শরীর কেমন?

—শরীর ভাল। কিন্তু মন ভালো নেই।

ইতিমধ্যে চা আসে। চায়ে চুমুক দিয়ে দেবু বলে—আমরা সবাই ভাল আছি। কিন্তু পিঙ্কির শরীরটা ভাল

যাচ্ছে না, দাদা।···ব্রেন টিউমার হয়েছে।

—ব্রেন-টিউমার? সুকুমারের বুকে কে যেন আচমকা হাতুড়ির ঘা মারে? একটা দশ-এগার বছরের মেয়ের এরকম জটিল রোগ?

—ভাল ডাক্তার দেখিয়েছিস?

—পিঙ্কিতে নিয়ে গেছিলাম। গত কয়েক মাস মেয়েটার মাথায় একটা যন্ত্রণা হত। গুমরে গুমরে কাঁদত শুধু। ডাক্তার বলল ব্রেনের এক্স-রে করতে। তাতেই ধরা পড়ল!···তৃপ্তির আর আমার মন খুবই খারাপ। মা ত শুধুই চোখের জল ফেলছেন। পিঙ্কিকে নিয়েই ত ওঁর সারাদিন কাটে।

—ডাক্তার বলছে কী?

—বলছে ভেলোরে অপারেশন করাতে হবে।

—ভেলোরে?

—হ্যাঁ। অনেক টাকার ব্যাপার। হাজার বারো ত বটেই। কয়েক সপ্তাহ ভেলোরে থাকতে হবে। কিছু টাকা আমি যোগাড় করেছি। পাঁচ হাজার টাকা আমাকে ধার দিতে হবে!

—ভেলোরে কে কে যাচ্ছিস?

—মেয়েটাকে নিয়ে আমি আর তৃপ্তি ত যাচ্ছিই। মা-ও সঙ্গে যেতে চাইছে। কিছুতেই শুনছে না। তাই মা-কেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। সুকুমার গুম হয়ে ভাবতে থাকে।

—দাদা—?

—উঁ?

—টাকাটা দিতে পারবে ত?

—কবে রওনা হচ্ছিস?

—আগামী শুক্রবার।···আমি ফিরে এসে কয়েক মাসের মধ্যেই টাকাটা তোমায় ফেরত দিয়ে দেব।···

—দেবু! সুকুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। একটু জোরে চেঁচানোর ফলে আশেপাশের টেবিল থেকে অনেকে মুখ তুলে তাকায়। মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নেয় সুকুমার। তার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবুর দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলে—

—একটা কথা মনে রাখবি।···আলাদা আলাদা থাকি বলে অমানুষ হয়ে যাইনি এখনও। বন্ধুর সঙ্গে ভদ্রতা করা যায়। দাদার সঙ্গে ভদ্রতা করছিস? পিঙ্কি আমাদের বাড়ির মেয়ে নয়?···টাকাটা আজই পেয়ে যাবি। ফেরত দেওয়ার কথা এখন উঠছে কেন?

—কিছু মনে কোরো না দাদা।···মাথার ঠিক নেই। আজই দেবে টাকাটা?

—হ্যাঁ, আজই। টাকাটা তুলেছিলাম একটা দরকারে। তোর কপাল ভাল যে আজই এসেছিস। সুকুমার হাসে। তারপর পকেট থেকে একশ টাকার বাণ্ডিলগুলো বের করে গুনতে থাকে।

—নে ধর। এতে ঠিক পাঁচই আছে। ভেলোরে পৌঁছে চিঠি দিবি। আর যদি সম্ভব হয় এখানে অফিসের নাম্বারে একটা ট্রাঙ্ককল···। খুবই চিন্তায় থাকব আমি।

—তা ত বটেই। দেবু টাকাটা পকেটে পোরে। তার-পর বলে—পরশু রবিবার। পারলে এস দাদা বাড়িতে। বউদিকেও নিয়ে এস। তৃপ্তি তোমাদের দেখলে একটু মনের জোর পাবে।

—নিশ্চয়ই যাব। রবিবারেই যাব। আমরা সকলে। দুপুরের দিকে। তোর কোন চিন্তা নেই। আমি তোর পাশে আছি। পিঙ্কি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে।···

দেবু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর একসময় উঠে পড়ে। সুকুমার চেয়ার থেকে উঠে তাকে নিচে নামবার সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দেয়।

* * *

বাস থেকে নেমে গলিতে ঢুকতেই লোড-শেডিং হয়ে গেল। যেন অদৃশ্য কোনও সুইচ্ অফ করে দিতেই বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে! আস্তে আস্তে অবশ্য সয়ে যাবে চোখ। একটু তীক্ষ্ণ চোখে নজর করলেই রাস্তার বিপজ্জনক খানাখন্দগুলো এড়িয়ে যাওয়া যাবে। পেছনে ঘনঘন বেল বাজিয়ে একটা সাইকেল আসছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে সরে যায়। সিঁড়িটা পুরো অন্ধকার। সব ফ্লাটের দরজা বন্ধ থাকায় সাসপেন্সে যেন থম্‌থম্ করছে জায়গাটা। পকেটে টর্চ নেই। মাঝে মাঝে স্টেয়ারকেসে নেড়িকুত্তা শুয়ে থাকে। এমনিতে ব্যাটারা নিরীহ। কিন্তু অন্ধকারে অসতর্ক পথচারীর পা যদি আচমকা পেটে পড়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই! ঠিক দাঁত বসাবে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে প্রায় অন্ধের মতো উঠতে উঠতে সুকুমার সাবধানে পা ফেলে। বেমক্কা কুকুরের কামড়কে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এই তো থার্ড ফ্লোরে তার ফ্লাটের বন্ধ দরজার সামনে সে পৌঁছে গেছে। কলিং-বেল বাজবে না। সুতরাং কড়া নাড়তে হল।

সুলেখা নয়। রীনাই দরজা খুলল। ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

—বাবা, আমি রীনাদিদির সঙ্গে লুডো খেলছি। বাপ্পার উল্লসিত গলা।

—বেশ করছ। পড়াশোনা হয়ে গেছে? জুতো খুলতে খুলতে সুকুমারের প্রশ্ন।

—করেছি। মা শুয়ে আছে।

—কেন?

—বৌদির মাথা ধরেছে খুব। বাপ্পা না। রীনাই উত্তর দেয়।

—আবার মাথা ধরল কেন? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে সুকুমার ঘরে ঢোকে। অন্ধকার ঘর। বাইরে, টেবিলে, হ্যারিকেনের আবছা আলোয় সুকুমার বুঝতে পারে শুধু সুলেখা জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে খাটে।

—কী ব্যাপার? মাথা ধরল কেন? ওষুধ-টষুধ কিছু খেয়েছ? সুকুমারের গলায় যেন একটু বেশি উদ্বেগ।

—খেয়েছি একটা ট্যাবলেট। অস্ফুটে উত্তর সুলেখার। ঘরের মাঝখানে, আলো-আঁধারিতে, অনিশ্চিতভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমার। তারপর কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলতে থাকে—আজ টিভিটা কেনা হল না, বুঝলে? দেবু এসেছিল, পিঙ্কির ব্রেন-টিউমার ডিটেকটেড হয়েছে।··· ওকে ভেলোরে নিয়ে যেতে হবে।···বেশ কিছু টাকা দেবুকে ধার দিতে হল।···আসছে রবিবার একবার সকলে ওর বাড়ি যাওয়া উচিত···। যেন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উগরে দিয়ে সুকুমার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।···

···অন্ধকারে সে সুলেখার মুখ দেখতে পায় না।···

সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ

কিছু প্রশ্ন কিছু তথ্য

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বাবরি মসজিদ ধূলিসাতের ঘটনা কতকগুলি প্রশ্নকে আমাদের সামনে টেনে নিয়ে এসেছে।

প্রথম প্রশ্ন : সত্য ও তত্ত্বের বিরোধ হলে কী হয়?

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের আদর্শ সূত্র হিসেবে মুণ্ডকোপনিষদের ৩।১।৬ সংখ্যক শ্লোকটির থেকে 'সত্যমেব জয়তে' অংশটি নির্বাচন করা হয়। বাণীটির অর্থ স্পষ্ট। মিথ্যার নয়, সত্যেরই জয় হয়। এখানে সত্য কথাটির তিন রকম তাৎপর্য। এক রকম হল, যা ঘটেছে বলা হয়েছে তা সত্যিই ঘটেছে। ঘটনাটি উল্লেখ করার সঙ্গে ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক মূল্যবিচারের কোন নীতি লিপ্ত নেই। যেমন, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ এক জনতা কয়েকটি গম্বুজসমেত এক জীর্ণ বাড়ি ভেঙেছে। শুধু এটুকু উল্লেখের থেকে বোঝা যায় না কাজটা ন্যায় কি অন্যায়। কিন্তু এটা ঘটনা বা সত্য। কিন্তু আর এক রকম সত্য আছে যার গায়ে নিশ্চিতভাবে মূল্য-বিচার-নীতি লেগে আছে। যেমন, ঐদিন সাধুবেশী এক জনতা অন্যের জমিতে জোর করে ঢুকে অন্যের ধর্মস্থান ধ্বংস করে। এই উল্লেখের সবটাই এক দলবদ্ধ অপরাধের বিবরণ। এই দুরকম ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যা কোনও জীবনাদর্শকে প্রকাশ করে। যেমন পিতার সত্য পালনার্থে রামের বনবাস যাত্রা। এখানে ন্যায়, ধর্ম ইত্যাদি শব্দ সত্যের সমার্থক।

সুতরাং মূল্যবিচার নিরপেক্ষ তথ্য, মূল্যবিচার সংযুক্ত তথ্য এবং ন্যায়নীতি বা সাধনযোগ্য ব্রত বা স্বপ্ন—এই তিন রকমকেই সত্য বলব। প্রথমের দু রকম সত্যেরই অবস্থান অতীতে, কারণ ঘটে যাওয়া মাত্রেই সমস্ত ঘটনা হয়ে যায় অতীতের বিষয়। অবশ্য অতীতের ঘটনাবলির সত্য বিবরণ খুবই দুর্লভ। আমরা যখন সত্য ইতিহাস বা পূর্ণ ইতিহাস বলে কিছু উপস্থাপন করি তখন তা থাকে অসম্পূর্ণ ও বহু স্থলে বিকৃত। যেমন, উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ একটা স্বর্ণযুগ এবং তার গৌরব রচনায় সমুদ্রগুপ্তের দানই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই ঘটনাটাকে বিপরীত দিক থেকেও দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের দেশে দেশে তিনি যে হত্যার তাণ্ডব ও লুণ্ঠনের দাপট দেখিয়েছেন তারই প্রশস্তি গেয়েছেন তাঁর সভাকবি হরিষেণ। কোথায় কী ভাবে গেয়েছেন? এলাহাবাদ শিলালিপিতে অশোক লিখেছিলেন শান্তি ও মৈত্রীর জয়গান। যেন তাকে ধিক্কার দিতেই হরিষেণ লিখেছেন সেই একই শিলার উপরে সমুদ্রগুপ্তের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধের জয়গান। দক্ষিণ ভারত থেকে লুঠ করে আনা বিপুল স্বর্ণে গুপ্তযুগ হয়েছে স্বর্ণযুগ। একটি মুদ্রায় তিনি বীণা বাজাচ্ছেন বলে তাঁকে সংগীত ও শিল্প রসিক বলা হয়েছে, কিন্তু বাকি সবগুলো মুদ্রাতেই তিনি অস্ত্রধারী ও হত্যাবিলাসী। এটা কৌতুককর যে যেসব কীর্তির জন্যে সমুদ্র গুপ্ত বন্দিত সেসব কীর্তির জন্যেই গজনীর মাহমুদ নিন্দিত। দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈষম্য সত্য অনুধাবনে আমাদের বিভ্রান্ত করে।

সুতরাং সত্যের সন্ধান ক্রমাগত চলতেই থাকে। অতীতের সত্যের তাৎপর্য এই যে তা ভবিষ্যতের পক্ষে শিক্ষার আলোক পাত করে। যেমন বিদ্যুতের খোলা তার ছুঁয়ে একবার শক্ খেলে পরের বার ঐ রকম তার ছোঁওয়ার ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি। ব্যক্তিত্ব অনুসারে এক এক ব্যক্তি কোন সত্যে কতটা প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হবে তা নির্ভর করে।

সত্যের থেকে তত্ত্বের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু তা বলে সব তত্ত্বই সত্যভিত্তিক নয়। অনেক সময় তা বিভিন্ন সত্যের থেকে প্রাপ্ত সংকেতগুলির একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। যেমন ফ্লিঁকেন হকিঙের আবিষ্কৃত সময়ের ইতিহাসের উৎস। অনেক সময় নিরঙ্কুশ শক্তি ও শ্রেষ্ঠতা অর্জনের জন্যে তত্ত্ব হল একটা অস্ত্র যার প্রয়োগে যে কোন কারণে অবস্থিতের অস্তিত্ব বিপন্ন বা ধ্বংস হয়। এক্ষেত্রে তত্ত্বের কোন তথ্যের ভিত্তি থাকে না, তা শুধুই সত্যশূন্য একটা উগ্র প্রচার। যেমন নাৎসিদের আর্যীয় শুদ্ধতার তত্ত্ব। এমন অবিশ্রান্ত ভাবে সর্বত্র এই তত্ত্ব প্রচার করা হয় যে দশচক্রে ভগবান ভূত

হয়ে যায়। নাৎসি জার্মানদের আর্যীয় শুদ্ধতার তত্ত্ব সম্প্রসারিত হয়ে একটা পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপায়িত হয়। তাবৎ শুদ্ধিকরণ তত্ত্বেরই গতি বা প্রকৃতি একই রকম অনিবার্য—ধ্বংসের বিস্ফোরণ।

জানুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ে দেখা গেল মুসলিম তামিল গুজরাতি বাঙালি প্রভৃতির থেকে মহারাষ্ট্রকে শুদ্ধ করে হিন্দু মহারাষ্ট্রীয় অঞ্চল গঠনের জন্যে হিংস্র হাঙ্গামা। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্গিবাহিনী বিংশ শতাব্দীতে শিবসেনারূপে আবির্ভূত। রক্ত, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি শুদ্ধিকরণের সমস্ত প্রক্রিয়াই ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে হতে কোন-না-কোন পর্বে চূড়ান্ত বর্বরতায় পৌঁছতে বাধ্য। আর শুদ্ধিবাদীদের পক্ষে এটা দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বিগত দশ হাজার বছরে মানব সমাজ বহুতর মিশ্রকরণের পরিণামে এক বিচিত্র সঙ্কর প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

শুদ্ধ শোণিত তত্ত্বের মত আর একটি তত্ত্ব হল মুসলমানের মসজিদের স্থলে হিন্দু মন্দিরের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সূত্রপাত হল বাবরি মসজিদের স্থলেই ত্রেতাযুগে রামের জন্ম হয়েছিল বলে দাবি উত্থাপন করে। হিন্দু পুরাণ অনুসারেই ত্রেতাযুগে জন্ম হয়েছিল রামের। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগগুলি কোনটি কত বছর ব্যাপী? এ প্রশ্নের নানা পণ্ডিত নানা উত্তর দেবেন। যেখানে রামের জন্মসালেরই ঠিক নেই সেখানে রামের জন্মস্থান ঠিক হল কী ভাবে? ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ থেকে কিছু লোক অযোধ্যা ও ফৈজাবাদের পথে পথে রিকশ চড়ে মাইকে প্রচার চালায় যে রামলালা অযোধ্যার বাবরি মসজিদের ভেতরে আপন জন্মস্থানে 'স্বয়ং প্রকটিত হুয়া'। পুলিস অনুসন্ধান করে জানতে পায় যে ১৯৪৯ এর ২২ ডিসেম্বর রাতে কয়েকটা লোক তালা ভেঙে বাবরি মসজিদের ভেতরে ঢুকে মূর্তিগুলি রেখে আসে। কিন্তু এই প্রতাকরকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সরকার যতই কালক্ষেপ করতে লাগল ততই মামলা জটিল হতে লাগল। ধাপ্পাবাজদের সঙ্গে প্রতিদিনই যোগ দিতে লাগল নতুন নতুন ধান্দাবাজ। ক্রমে রাজনীতিবিদগণ। এখন সাধুসন্তরাও।

সহজবোধ্য কারণেই এই তত্ত্বের বর্তমান প্রবক্তারা প্রমাণ বা বিচারের বিষয়কে বাদ দিয়ে বিশ্বাসের কথা বলছেন। ঐ স্থানটিতেই রামের জন্ম হয়েছিল বললে ঐ মূল তত্ত্বের সঙ্গে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ফুলফল সবই আসবে। অর্থাৎ প্রজাতোষণের জন্যে সত্যবর্জন, জ্ঞানবিজ্ঞানে কায়েমী স্বার্থের একচেটে অধিকার ও কায়েমী স্বার্থ বহির্ভূত কেউ জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হলে তার মুণ্ডচ্ছেদ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য পররাজ্য গ্রাসের অভিযান। এসবই রাজা রাম করেছিলেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ একশ বছর আগে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে শঙ্কিত লেখনীতে লিখেছিলেন, শ্বেতবর্ণ ইউরোপীয়দের অপেক্ষা আমাদের 'অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের "জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি" পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে?' সাম্প্রতিক বাতাবরণে 'রাজা'র বদলে 'রাজনীতিবিদ' এবং 'ব্রাহ্মণে'র বদলে সাধুসন্ত পড়তে হবে। এককথায় আদর্শের সত্য ও বিশ্বাসের তত্ত্বের মধ্যে বিরোধে তত্ত্ব জয়ী হলে দেশবাসীর সর্বনাশ হবে নাকি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সত্যতা ও জনতার মধ্যে বিরোধ হলে কী হয়?

পৃথিবীর সর্বত্রই যখন জনগণের অধিকার ও ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে তখন ধরে নেওয়াই ভাল যে জনতা সর্বশক্তিমান, অন্তত জনতার ইচ্ছাই সবচেয়ে মূল্যবান। রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগেও জনতার ক্ষমতা যে কী বিপুল তা আমরা ইংলণ্ডে ফ্রান্সে দেখেছি। এই শতাব্দীতেই দেখেছি রাশিয়াতেও। আর প্রতিবেশী দেশ ইরানে সম্প্রতি দেখেছি পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজবংশের উৎখাত। সর্বত্র জনতার জাজ্বল্যকার। তবে জনতার পরাক্রমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা যায় রামায়ণের কাহিনীতে—সুরাসুর যাঁর ভয়ে কম্পিত ত্রেতাযুগের অবতার সেই স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে। জনতাকে তোষণ করতেই রাম পরিত্যাগ করেছিলেন সীতাকে। সীতার বিষয়ে সত্য যে কী তা কি রাম জানতেন না? একশবার জানতেন। তবু যখন জনতার দাবি উঠল তখন সেই দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে হল রামকে।

রামচন্দ্রের মনে কি জনতার দাবিতে কোনও দ্বন্দ্ব জাগেনি? একশবার জেগেছিল। যুদ্ধকাণ্ডের একোনবিংশাধিকশততম সর্গে চিতার ভেতর থেকে সীতাকে কোলে নিয়ে স্বয়ং অগ্নি বেরিয়ে এসে রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'যিনি আত্মশুদ্ধা, তাঁকে আমি আর কী শুদ্ধ করব?' কিন্তু রামচন্দ্র যখন শুনলেন যে সীতা সম্পর্কে রাজ্যের জনতা নানা

রকম কথা বলছে তখন তিনি অতিশয় কাতর হয়ে ভাইদের ডেকে পাঠালেন। উত্তরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গে রাম ভাইদের বললেন, 'আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা·····(কিন্তু) ভালমন্দ বিচারের আবশ্যকতা নাই।' (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ) রাম যখন বনবাসে যান তখন তিনি সত্যপালন করেন এবং যখন সীতাকে বনবাসে পাঠান তখন তিনি জনতাতোষণ করেন।

সত্য যে কী তা নিঃসংশয় রূপে জানা সত্ত্বেও সীতাকে পরিত্যাগ করে রাজা রামচন্দ্র কার্যত সত্যকেই পরিত্যাগ করেছিলেন। স্বয়ং রাম যখন সিংহাসন রক্ষার জন্য সত্যবতী সীতাকে পরিত্যাগ করে প্রজাতোষণ নীতি গ্রহণ করলেন তখন সাধারণ রাজা অথবা রাজন্যতুল্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তি কী করবেন তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এই শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসেই নারীর জন্যে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু এরকম ঘটনা ইতিহাসে খুবই বিরল।

ক্ষমতাসীন হওয়ার বা থাকার জন্যে প্রজাতোষণই মুখ্য কথা। পৃথিবীর অধিকাংশ, প্রায় সমস্ত, রাজনীতিবিদদের কথাই রাম বলেছেন, 'ভালমন্দ বিচারের আবশ্যকতা নাই।' এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্যতা ও জনতার মধ্যে বিরোধের পরিণাম অনুমান করা যায়। ক্ষমতার আসনে থাকার জন্যে ত্রেতা যুগের যে তত্ত্ব কলিযুগেরও সেই একই তত্ত্ব—তার নাম তোষণনীতি। যদিও আমরা আধুনিক ভাষায় ভোটব্যাঙ্কের দিকে নজর রেখে যে যার মত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি কিন্তু আসলে আমরা সকলেই ক্ষমতায় থাকার জন্যে বা আসার জন্যে ভালমন্দের সত্যমিথ্যার কথা শিকেয় তুলে রেখে প্রাণপণে জনতার তুষ্টিকরণের চেষ্টা করছি। সত্যকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার জন্যে তোষণনীতি যদি খারাপ হয় তাহলে আরও-খারাপ হল তোষণনীতিতে প্রকৃত লাভবান যখন চেঁচায় যে বঞ্চিতদের তোষণ করা হচ্ছে।

এবার দেখা যাক, কে কাকে তোষণ করছে আর কে-ই বা বঞ্চিত। কাকে তোষণ করা অধিকতর লাভজনক? ১০০ জনের মধ্যে ১২ জনকে তোষণ করা বেশি লাভজনক, না ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনকে তোষণ করা বেশি লাভজনক? কার্যত ৮০ জনকেই বেশি তোষণ করা হচ্ছে। সমস্ত কলকাতা জুড়েই সরকারি জমিতে বেআইনী মন্দিরগুলোই ৮০ জনের প্রতি ক্ষমতাসীনের তোষণনীতির প্রকৃষ্ট চাক্ষুষ প্রমাণ। বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গেই যখন এভাবে জনতা-তোষণ চলে তখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা অনুমান করা যায়। ১৯৪৯-এই যখন রাতের অন্ধকারে বাবরি মসজিদের ভেতরে লুকিয়ে রেখে আসা রামলালার তথাকথিত 'স্বয়ং প্রকটিত' মূর্তি ফেলে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ফেলে দেওয়া হয়নি, উপরন্তু সেই মূর্তি পুজোর ব্যবস্থাও করা হল তখন বোঝাই যাচ্ছে যে কে কার তোষণ করছে। নির্বাচনে ধর্মকে ব্যবহার সংবিধান-বিরোধী, কিন্তু ধর্মস্থান নির্মাণের জন্যে কোন রাজ্য সরকার গঠিত হলে সংবিধান রক্ষকদের নিষ্ক্রিয়তা তোষণনীতির পরাকাষ্ঠা। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠেরই যে তোষণ করা হবে এটাই স্বাভাবিক। তবু কখন কখন লোক দেখাবার জন্যে, নিরপেক্ষ সাজবার জন্যে সংখ্যালঘুকেও তোষণ করা হয়।

আর তখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মনির্ধারিত নেতারা গাছের ডালে ডালে বাড়ির ছাদে ছাদে চিৎকার শুরু করে: সংখ্যালঘু তোষণ করা হচ্ছে, সংখ্যালঘু তোষণ করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু শব্দটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ঐ সম্প্রদায় সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংখ্যায় দুর্বল এই সম্প্রদায় ধনসম্পদেও দুর্বল কিনা? সত্য এই যে ভারতের জনসংখ্যার কমবেশি ১১% যে-সম্প্রদায় তারা ধনসম্পদের দিক থেকেও দুর্বল। গোপাল সিং রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, দেশের বহু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এই দুর্বল সম্প্রদায়ের নাম নথিভুক্ত করতেও অস্বীকার করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে এই সম্প্রদায় ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক থেকেও বিরূপ ব্যবহার পায়। সংখ্যালঘুদের চাকরিতে ঠাঁই নেই, ব্যবসার জন্যে পুঁজি নেই। সংখ্যায় ও সম্পদে, দুদিক থেকেই যারা দুর্বল তাদের তোষণ করে কোন্ বেকুব? দুর্বলদের জন্যে কোনও বিশেষ বিবেচনা কোনমতেই তুষ্টিকরণ নয়, তা নিতান্তই একটা মানবিক আচরণ। মিথ্যার বেসাতি করে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা যে ন্যূনতম মানবিক আচরণকেও তুষ্টিকরণ বলবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরিখে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলির তালিকায় ভারত প্রথম দশটি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে—আরও ঠিক ভাবে বললে বলা উচিত, ষষ্ঠ স্থান। এই ষষ্ঠ স্থান লাভ করার ব্যাপারে ডিসেম্বর '৯২ জানুয়ারি '৯৩ পর্বে বম্বে সুরাট আমেদাবাদ প্রভৃতি শহরে সরকারি পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা গণনা করা হয়নি। করলে ভারতের স্থান তালিকায় আরও দু-এক ধাপ উপরে উঠবে।

ভারত যদি ৮০% জনতার আরও বেশি তুষ্টিকরণ করতে শুরু করে তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলির তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করবে। আসল ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? সংখ্যালঘুর তোষণ হচ্ছে এটা সর্বৈব মিথ্যা, আসলে হচ্ছে সংখ্যাগুরুর তোষণ। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে আগেই চিলের পেছনে না ছুটে নিজের হাতটা একটুখানি তুলে দেখা উচিত যে কানটা কোনখানে আছে। এদিকে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে থেকে ধর্মান্ধ জনতার চাপ যতই তীব্র হবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি ততই নৈতিক দৃঢ়তা পাবে।

আর এটাও মনে রাখতে হবে যে রামরাজ্যের যুগে নিচু বর্ণের মানুষ উঁচু জ্ঞান লাভের চেষ্টা করলে তার গলা কেটে ফেলে ক্ষমতার আসনকে বাঁচানো যেত কিংবা পররাজ্য গ্রাসের জন্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া দিকে দিকে পাঠানো যেত। এ যুগে তা আর সম্ভব নয়। এবং তা সম্ভব নয় বলেই হায়দ্রাবাদ জয় করার মত কাশ্মীর জয় করা সম্ভব হয়নি, বরং কাশ্মীর সমস্যা আজও একটা সুদীর্ঘ জটিল সমস্যা হয়েই আছে, তার কোনও আশু সমাধানও দেখা যাচ্ছে না। ইতিহাসের পরিহাসে জম্বুর মহারাজা হরি সিঙের কাশ্মীর এখন তিন খণ্ডে বিভক্ত—এক খণ্ড ভারতের, এক খণ্ড পাকিস্তানের এবং তৃতীয় খণ্ডটি চীনের অধিকারে। ভালমন্দ ও সত্যমিথ্যার বিচার ভুলে সাধুসন্ত ধর্মান্ধদের তোষণ ভারতকে আরও খণ্ড খণ্ড করবে নাকি?

তৃতীয় প্রশ্ন: ইতিহাসের অন্যায় কতখানি সংশোধন সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কি?

ইতিহাস ন্যায় ও অন্যায় দিয়ে পরিপূর্ণ। দূর অতীতে সংঘটিত অন্যায়ের কোনও প্রতিকার অসম্ভব। হিন্দুরা যে বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার ধ্বংস করল, শশাঙ্ক যে বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করল, বহু হিন্দু রাজা যে কাশ্মীরের বহু মন্দির লুণ্ঠন করল, এখনও যে গয়ায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের বহু সম্পত্তি নিজের অধিকারে রেখেছে—এসবের কোন্‌টার সংশোধন সম্ভব? মহারাষ্ট্র থেকে এসে বর্গিরা যে প্রায় তিন শ বছর আগে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে 'হর হর মহাদেব' হেঁকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধর্ষণ লুণ্ঠন করত তারই বা কী প্রতিকার আজ সম্ভব?

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যায় সংশোধন যদি বা সম্ভব, গায়ের জোরে একবারেই সুদূর-পরাহত। বর্বর শক্তির প্রয়োগ ব্যাপারটাই অন্যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি করে তাহলে আরও বেশি অন্যায়। বঙ্গ মানুষ যা-ই ভাবুক, সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের মানতেই হবে যে অতীতে সংঘটিত অন্যায়ের অনুকরণে বর্তমানে নতুন অন্যায় যোগ করে অন্যায়ের পরিমাণ শুধু বৃদ্ধি করাই হয়।

এখানে যেসব বাঙালি ইতিহাসের অন্যায় সংশোধনের জন্যে বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণ করতে চান সেসব বাঙালির কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। ১৯৪৭এ শরৎচন্দ্র বসু সুহরাবর্দি প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি যখন অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মৌলনা আক্রাম খাঁ প্রমুখ নেতারা বাংলা ভাগই দাবি করেছিলেন এবং সেই অনুসারে জনমত সংগঠন করেছিলেন। বাবরি মসজিদ ভেঙে—ইতিহাসের অন্যায় সংশোধন করে—যেসব বাঙালি রাম মন্দির নির্মাণ করতে চান তাঁরা বাংলা ভাগের অন্যায় সংশোধনের জন্যে কী চিন্তা করছেন জানিনা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এই অন্যায় সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রাক-১৯৪৭ বাংলা পুনরায় নির্মাণ এবং ১৯৪৭-উত্তর পর্বে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিদের পশ্চিমবাংলা ত্যাগ করে পূর্ব বাংলায় নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে প্রত্যাবর্তন। এটাই হল বাংলা ভাগের অন্যায় সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যেসব বাঙালি ইতিহাসের অন্যায় সংশোধনের জন্যে বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির নির্মাণে উৎসাহী তাঁদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাংলা ভাগ নামক যে-অন্যায়ে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ফলগ্রস্ত সেই অন্যায় সংশোধনের জন্যে সর্বাগ্রে আন্দোলন সংগঠন করা। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে সংঘটিত অন্যায়ের সংশোধনে ব্রতী না হয়ে পাঁচশ বছর আগের অন্যায় সংশোধনে ব্রতী হওয়ার পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য এবং কোন্ অধিকার আছে?

চতুর্থ প্রশ্ন: ভারতীয় মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন থাকা উচিত কিনা?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তরে আমি পাল্টা প্রশ্ন করব: অহিন্দুর ব্যক্তিগত আইন থাকা উচিত কিনা এ প্রশ্ন করার আমি কে? আমি যেহেতু বহুল পরিমাণে হিন্দু জীবনধারার মধ্যে বাস করি, যেহেতু আমি পাড়ার পুজোতে চাঁদা দিতে বাধ্য থাকি সেজন্যে আমি মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলার অধিকারীই নই। তবে ব্যক্তিগত অধিকার বলে কি কোনও মুসলমানের আপন

পরিবারেরর মধ্যে কাউকে হত্যার অধিকার আছে? এটা নিতান্তই ফৌজদারি বা অপরাধমূলক আইনের প্রশ্ন। সমস্ত ভারত জুড়ে একটিমাত্র কমন ক্রিমিনাল কোড আছে। কিন্তু সর্বজনীন ফৌজদারি আইন থাকলেও এই আইন কিন্তু সমান ভাবে সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি প্রয়োগ করা হয় না। এ বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৩র টেলিগ্রাফ দৈনিক পত্রিকার ৪ সংখ্যক পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ঐ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যে বধূহত্যা হলে তাঁরা আদালতের আওতার বাইরে নিজেদের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করে নেন এবং যদি কোন মৃত বধূর পিতৃগৃহ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে মাড়োয়ারি সম্প্রদায় তাঁকে পরিত্যাগ করেন। প্রকাশ্যে আইন অমান্য করে রাজস্থানে গঙ্গৌর উৎসবের দিন মহা ধুমধাম করে বালিকাদের বিপুল সংখ্যায় বিবাহ দেওয়া হয়। তাছাড়া বহু হিন্দুর একাধিক বিবাহ আছে ও বহু হিন্দু একাধিক বিবাহ আজও করছে। আমার নিজেরই জানা এরকম ঘটনা আছে যে স্থানীয় থানা ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানালে তারা নতুন বৌটিকে ও তার দাদাকে বলে, কোর্টে গিয়ে ডিভোর্সের মামলা করো। তাদের মামলা করার টাকা নেই। মেয়েটি শহরে এসে বর্তমানে যাদবপুরে লোকের বাড়িতে কাজ করছে। এসব অসহায় মেয়েদের জন্যে আইন অর্থহীন। তাহলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন তুলে দেওয়ার জন্যে হিন্দুদের মাথা ব্যথা কেন? যারা মুসলমানের পৃথক ব্যক্তিগত আইনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার তাঁরা কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে আইনভঙ্গের অজস্র দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অন্ধ সেজে থাকেন। পাল্লার একদিকে এক শাহবানু অন্যদিকে বহু দুর্গারানি আছে এটা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

কোনও হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনের বিরোধিতা করার আগে জেনে রাখা ভাল যে কেন সমস্ত হিন্দুদের জন্যে এক দেওয়ানি আইন থাকা অত্যাবশ্যক। এই আইনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করে ১৯৫৫র ৫মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এক অসাধারণ বক্তৃতায় বলেছিলেন: হিন্দু সম্প্রদায় নামে এক হলেও কাজে এক এক অঞ্চলবাসীর এক এক ভাষাগোষ্ঠীর এক এক রকম আইনকানুন; যেমন, দক্ষিণ ভারতে মামা ভাগ্নীর বা পাত্রাবে দেওর ও বিধবা বৌদির মধ্যে বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত; সম্পত্তি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের কোন অঞ্চলে দায়ভাগ, কোন অঞ্চলে মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত। হিন্দু দেওয়ানি আইনের এইসব বিভেদ বৈষম্য স্বাধীন ভারতের বিচার ব্যবস্থার পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল বলেই ঐ বিভ্রান্তিগুলি দূরীকরণের জন্যে একটি সুষম, সুসম ও কমন আইন প্রণয়নে জওয়াহারলাল উদ্যোগ নেন। আইন প্রণীত হলে দেখা গেল যে মৃত পিতার সম্পত্তিতে কন্যার সমান উত্তরাধিকার, প্রয়োজন মত বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা, বিবাহ সরকারি নথির অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে হলফ পাঠ এবং সরকারের চোখে বিবাহকে চুক্তির সমতুল্য করা ইত্যাদি প্রচলন করে হিন্দু দেওয়ানি আইন বহুলাংশে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনেরই অনুরূপ হল। স্বভাবতই হিন্দু রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ এই আইন প্রণয়নে যথা-সাধ্য বাধা দিয়েছিলেন এবং 'গুরুজী' গোলওয়ালকর 'স্পট-লাইটস' (১৯৭৪) নামক গ্রন্থে কমন কোডের তীব্র বিরোধিতা করে একথাও লিখেছেন যে হিন্দুদের বহু বিবাহের পথে বাধার সৃষ্টি করে হিন্দু পুরুষদের জন্যে পতিতালয়ে যাওয়ার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা মুসলমানের পৃথক ব্যক্তিগত আইন রদ করার দাবি করেন তাঁদের কাছে জানতে চাই যে এতে মুসলমানরা পৃথক কী কী সুবিধা পাচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাবে যে ধনী মুসলমান পুরুষরা কিছু সুবিধা পাচ্ছেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় অসুবিধাই ভোগ করছেন। সুবিধাটা মোটামুটি বিবাহ তথা যৌন সংক্রান্ত—মুসলমানদের বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থাটা যুক্তিপূর্ণ ও সরল। একদা শ্রীচৈতন্যও হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মকানুন সরল করেছিলেন। কালক্রমে শ্রীচৈতন্যের বিদ্রোহ হিন্দু কায়েমী স্বার্থের কাছে পরাস্তই হয়েছে। ১৯৬১-র সেন্সাসেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের বহু-বিবাহের শতকরা ঘটনা বেশি। পরের সেন্সাসগুলিতে এই হিসেব নেওয়া হয়নি। কার্যত হিন্দু কায়েমী স্বার্থ নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরের কেউ একাধিক নারীসঙ্গের সুবিধা পেতে পারে এই পরিস্থিতিতে ঈর্ষা জর্জরিত। গুরুজী গোলওয়ালকর ঐ হিন্দু স্বার্থের অধিকার খর্ব করাতে প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধ, অন্যেরা নেপথ্যে ক্ষুব্ধ। এবং হিন্দু পুরুষের এই সুপ্ত ঈর্ষাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে সাধ্বী ঋতাম্ভরা হিন্দু পুরুষদের 'নপুংসক' বলে ধিক্কার দিয়ে থাকেন। গুরুজী-সাধ্বীজী প্রমুখের চতুর প্ররোচনায় মুসলমানরা চারটে করে বিবাহ করছে কল্পনা করে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সাধারণ হিন্দু পুরুষ বিদ্বিষ্ট হচ্ছেন এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিরুদ্ধে সেই বিদ্বেষকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সুবিধাশূন্য মুসলিম ব্যক্তিগত

আইন লোপ করার জন্যে হিন্দু দাবির আর একটা কারণ থাকতে পারে। সেই কারণটি কী? সাধারণ মুসলমানের উপকার করার শুভ ইচ্ছা। কিন্তু ধনী মাড়োয়ারির গৃহে তরুণী বধূর অকাল মৃত্যু যেমন সন্দেহজনক তেমনই বুদ্ধিজীবী-বিরোধী রামভক্ত হিন্দুর মুসলিম হিতসাধনেচ্ছাও একই রকম সন্দেহজনক, যদিও একটার সঙ্গে দেওয়ানি প্রশ্ন এবং অপরটার সঙ্গে ফৌজদারি প্রশ্ন জড়িত। প্রশ্ন হচ্ছে, রামভক্তরা কি প্রকৃতই মুসলিম সমাজের উন্নতিসাধনের জন্যে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিলোপ চাইছে?

এক ভারতের জন্যে এক আদালত এক কানুন হওয়া উচিত। কিন্তু পৃথক আইন যাদেরকে বহু অসুবিধাজনক শর্তে পৃথক করে রাখছে তাদের মধ্যে থেকেই ভারতীয় আইন ব্যবস্থার সংহতি সম্পাদনের দাবি উত্থাপিত হওয়া উচিত। ঐ দাবি অনেক আধুনিক মুসলমানদের মধ্য থেকে উঠছেও, কিন্তু মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বিলোপের জন্যে হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের প্রচণ্ড গর্জনে প্রাগ্রসর মুসলমানদের দাবি চাপা পড়ে যাচ্ছে। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠের যারা সারা ভারতে এক দেওয়ানি আইনের জন্যে দাবি তুলছে তারা কাল সারা ভারতে এক ধর্মীয় বিশ্বাসের দাবি তুলবে না এমন কোন কথা আছে কি? আর যারা মতলব হাসিলের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের কোনও আশ্বাস বা শপথে বিশ্বাস করা যায় কি?

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন আছে।

হিন্দু মৌলবাদীদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাঁরা বলছেন যে ব্যক্তিগত আইনের ও তালাক দস্তুরের সুবাদে বিপুল হারে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে তাদের বক্তব্যের বাস্তবে প্রতিফলন কোথায়? এটা জোর গলায় বলা দরকার যে বাস্তবে হিন্দু মৌলবাদীদের বক্তব্যের কোনও ভিত্তি নেই। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬১—১৯৭১ দশকে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার ২৩'৬৯ থেকে পরবর্তী ১৯৭১—১৯৮১ দশকে বেড়ে হয়েছে ২৪'১৪; পক্ষান্তরে ১৯৬১—৭১ দশকে মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার ৩০'৮৪ থেকে পরবর্তী ১৯৭১—৮১ দশকে কমে হয়েছে ৩০'১৪। এই বিশেষ দশকটি নির্বাচনের কারণ এই দশকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের অভিযান সবচেয়ে তীব্র ছিল। সেই দশকেই হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ল কেন? জন্মনিয়ন্ত্রণহীন ও চার বিবাহের সুবিধাভোগী মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার কমল কেন? ১৯৯১-এর সেন্সাসের অধিকাংশ তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে এই সেন্সাসের পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে নীরব থাকতে হচ্ছে।

জনসংখ্যার হার-বৃদ্ধিতে অর্থনীতি ও শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং উন্নত অর্থনীতি ও ব্যাপক শিক্ষার জন্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা সুনিয়ন্ত্রিত। যেহেতু সাধারণভাবে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা বেশি তাই তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া ইসলাম ধর্মগ্রহণের ফলেও মুসলিম জনসংখ্যার কিছু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আবার ভারতের যেসব অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা বেশি সেসব অঞ্চলে তাদেরই জনসংখ্যার হার বেশি। রাজীব গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত তথ্য ভাণ্ডার কর্তৃক সংগৃহীত জেলাওয়ারি তথ্যগুলি থেকেই এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা বেশি তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনিবার্য কারণেই বাড়বে।

প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয় প্রধানত পাঁচটি কারণে: (১) নারীর উর্বরতা, (২) শিক্ষা, (৩) অর্থনীতি, (৪) ধর্ম-বর্জন-গ্রহণ ও (৫) অভিবাসন। যাঁরা অন্যান্য কারণগুলি উপেক্ষা করে বিবাহের সংখ্যার কথা বলছেন তাঁরা, সর্বোচ্চ আদালতে হলফনামা দিয়ে তলে তলে আসল মতলব হাসিল করার সুযোগ সৃষ্টি করার মত এক্ষেত্রেও, তাঁদের আসল কথাটা গোপন করার চেষ্টা করছেন। এই আসল কথাটা কী? অবাধ যৌন সম্ভোগের বাসনা।

মুখ্যত হিন্দু পুরুষের সুপ্ত যৌনঈর্ষাকে নিজেদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ব্যবহার করার জন্যেই হিন্দু মৌলবাদীরা শর্ত-সাপেক্ষে মুসলিমদের চার বিবাহের অনুমোদনকে আক্রমণের লক্ষ্য করেছেন এবং এই ভিত্তিহীন তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন যে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ফলে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। শুধু যৌনঈর্ষাই নয়, এর পেছনে আছে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রে 'হীনযোনি' নারীকে যেমন ভোগ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহারের সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা বিলোপকারী ১৯৫৫-র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই গুরু গোলওয়ালকর হিন্দু পুরুষের অন্ন-বা-পণ্য নারীগমনকে স্বাভাবিক বলেছেন। সম্প্রতি স্বামী মুক্তানন্দ সরস্বতী এক বিবাহের বিরোধিতা করে বলেছেন যে চাইলে হিন্দু পুরুষ ২৫ জন স্ত্রী রাখবে। এবং হিন্দু জনসংখ্যার মন্থর হার বৃদ্ধিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে সাধ্বী ঋতম্ভরা হিন্দুকে 'নপুংসক' বলে ধিক্কার দিয়ে আরও বেশি

করে পুরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য উত্তেজিত করছেন।

গুরুজী, স্বামীজী, সাধ্বীজী প্রমুখের যৌন প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আগ্রহ কি তাঁদের অস্বাভাবিক যৌন জীবনের বিচিত্র প্রকাশ? আর তাঁদের কথাতে যৌনঈর্ষা জর্জরিত হিন্দু জনতার প্রতিক্রিয়াই কি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিরোধিতায় রূপান্তরিত?

আরও একটি প্রশ্ন: কোনও ধর্মের মূলসত্য পুনরুদ্ধার এবং মৌলবাদ কি একই বস্তু?

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর: না। এবার উত্তরের ব্যাখ্যা। হিন্দু ধর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি।

আধুনিক কালে হিন্দু ধর্মের মূল কথা মূর্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে। তাঁকে সহজবোধ্য করেছেন বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন মনীষী। যাঁরা তাঁদের উচ্চমার্গী ধর্ম বুঝতে পারেন না তাঁরা নানারকম আচার-আচরণ বিচার-সংস্কার পালন করেন। এঁদেরকে গোঁড়া বা সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বলতে পারি। কিন্তু হিন্দু গোঁড়ামি আর হিন্দু মৌলবাদ এক বস্তু নয়। তবে গোঁড়া হিন্দু সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে মৌলবাদীতে রূপান্তরিত হতে পারেন।

হিন্দু মৌলবাদ মূর্ত হয়েছে লালকৃষ্ণ আডবানীর মধ্যে। মৌলবাদ প্রসঙ্গে আমার 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছি, 'মৌলবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অস্ত্র। মৌলবাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মনিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। মৌলবাদ মস্তিষ্ক-ক্রিয়াকে শুষ্ক করার জন্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে গৌরবান্বিত করে, বিচ্ছিন্ন অশিক্ষা ও ব্যক্তিগত অজ্ঞতার হীনতাকে তা আবৃত করে সংগঠিত অহমিকা দিয়ে।' আসলে মৌলবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ক্ষমতালোলুপদের অস্ত্র, ধর্মের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠের অজ্ঞতাকে তোষণই এর শাস্ত্র। ভারতে হিন্দু মৌলবাদ আছে, যেমন বাংলাদেশে আছে মুসলিম মৌলবাদ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ধর্মের নামে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যায়। এই সংজ্ঞার অনুসারে বাংলাদেশে যেমন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তেমনই ভারতে আছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা।

১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে Jean Calvin জেনেভা শহরে গিয়ে *Institution chrétienne* নামক গ্রন্থে মৌলবাদের দুটি সূত্র উপস্থাপন করেন: 'divine preordination' এবং 'God's elect'—এর প্রয়োগে তিনি ১৫৪১-এ জেনেভাতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্দেশে Michel Servet নামক বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে মারা হয়। সত্যসন্ধানীদের উপর আক্রমণ ও তাঁদের নির্মূলীকরণ মৌলবাদের সাধারণ বা সামান্য লক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি মৌলবাদ ইউরোপ থেকে আসে আমেরিকায়। যথেষ্ট প্রমাণ নেই আমার হাতে, কিন্তু আমার অনুমান হল, ১৮৯৩-এ বিবেকানন্দর চিকাগো বক্তৃতার প্রতিক্রিয়াতে একদল খ্রিস্টান সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নায়েগ্রা কনফারেন্সে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা ইতিহাস ও বিজ্ঞানচর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ১৯০৯ থেকে *The Fundamentals* গ্রন্থমালার প্রকাশ শুরু হয়। ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদের উদ্ভবে মার্কিন মৌলবাদীরা উদ্বুদ্ধ হয়, উদারপন্থীদের পথেঘাটে মারধোর শুরু করে, টেনেসি রাষ্ট্রের ডেটন শহরের এক স্কুলে ডারুইনবাদ পড়ানোর অপরাধে John T. Scopes-এর বিরুদ্ধে মামলা করে। এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে S. G. Cloe-র *History of Fundamentalism*, G. T. Cobb-এর *Modernism vs. Bible Christianity*, গুরু গোলওয়ালকরের *We or Our Nationhood Defined*, *Bunch of Thoughts*, *Spotlights* প্রভৃতি গ্রন্থ পঠনীয়।

হিন্দু মৌলবাদের জন্মের আগেই গোলওয়ালকর *We or Our*……বইয়ে লিখেছিলেন যে তাঁর রাষ্ট্রে একমাত্র হিন্দু ধর্ম ও হিন্দি ভাষা থাকবে। অন্য ধর্মাবলম্বী বা অন্য ভাষাভাষীদের কোনও নাগরিক অধিকার থাকবে না। দেশভাগের পরে হিন্দু মৌলবাদীরা আসল স্বরূপ গ্রহণ করে। গডসে ভক্তের ভঙ্গিতে গান্ধীকে হত্যা করে। কল্যাণ সিং মসজিদ ভাঙাকে নিশ্চিত করে আদালতে আনুগত্য দেখিয়ে। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের ঘোষিত হিসাব বড়বাজারের ঘোষিত হিসাবের মতই মিথ্যা। হিন্দু মৌলবাদের প্রকাশ্য পদক্ষেপগুলির আড়ালে হিন্দু পুরুষদের অবাধ যৌন অধিকার, বিশুদ্ধ ভোগ্যপণ্যে নারীর রূপান্তর, নারীর উত্তরাধিকার বিলোপ ও জীবিকার্জনকে নিষিদ্ধ করা এবং বর্ণাশ্রম প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের তত্ত্ব আত্মগোপন করে আছে। ইতিমধ্যেই এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সন্ত সম্মেলনে বর্ণাশ্রমপ্রথার এবং নারীকে গৃহের অভ্যন্তরে রাখার দাবি উঠেছে। এক আইন, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক পুরুষের বহু নারীর উপর অবাধ অধিকার এবং বুদ্ধিশক্তির অপমান ও পশুশক্তির জয়গান প্রভৃতি প্রসঙ্গে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু প্রভৃতি সমস্ত মৌলবাদীদেরই কি একই স্বরূপ নয়?

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ঃ পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত

অসীম মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। গোড়াপত্তন করার গুরুদায়িত্ব এককভাবেই পালন করেন গুটিকয়েক বিজ্ঞান-মনস্ক ইউরোপীয়। ধীরে হলেও তাঁদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সাড়া ফেলে দেয় শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে। আজন্ম কুসংস্কারের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ উপেক্ষা করে,তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চায় উদ্যোগী হয়। ফলতঃ সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে, ব্যক্তিগত উৎসাহে এদেশে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা। ১৮১৩ সালে এই বেসরকারি উদ্যোগ সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়। কেবল তাই নয়, এই সালে তাঁরা প্রণয়ন করলেন, একটি বিশেষ সরকারি আইন। এই আইনে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন,—"A sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India."[১] কিন্তু, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে, সরকারের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হল না। সে বিচারে, হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে দিয়েই, এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞান অনুশীলন। স্থাপিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয় বিজ্ঞান চর্চা। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ এই সময়কালে, এই প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও গণিত পড়াতেন সুপণ্ডিত টাইটলার, রসায়ন বিজ্ঞান পড়াতেন রসসাহেব। এছাড়া, ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বীজ-গণিত সেই সময় এই বিদ্যারতনে পড়ানো হত।[২] এইভাবে, হিন্দুকলেজে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে, এদেশীয় জনসাধারণ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু, এরই সঙ্গে যে প্রবণতাটি সে সময়ে প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, তা হল, মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চার প্রতি দেশীয় শিক্ষিত সমাজের বর্ধমান আকাঙ্ক্ষা। সুখের কথা, তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রইল না বেশি দিন। অভাব পূরণে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিলেন বিদ্যোৎসাহী ইউরোপীয় ব্যক্তিরাই। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সক্রিয় সাহায্যে, তাঁদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়, উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়। প্রকাশিত হয় বাংলা বিজ্ঞান গ্রন্থ। পূরণ হয় বাঙালির দীর্ঘ প্রত্যাশা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের শুভ সূচনা হয় ১৮১৭ সালে। এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নেয় কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। প্রকাশিত হয়, বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লিখিত প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'মে-গণিত' (১৮১৭)। লেখক রবার্ট মে। চুঁচুড়া অঞ্চলের সরকারি বিদ্যালয়গুলির প্রধান পরিদর্শক ছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার প্রথম ঐতিহাসিক দলিল ছাড়া, উল্লেখিত বইটির বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থ—'গণিতাঙ্ক'। প্রকাশকাল ১৮১৯। লেখক, জন হার্লে নামক একজন ধর্মযাজক। কবিতার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার অবতারণা। এবং কবিতাতেই সেই সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা জন হার্লে ই তাঁর উল্লেখিত বইটিতে করেন। একই বৎসরে উইলিয়াম হপকিন্স পিয়ার্সের 'ভূগোল বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় শরীর ও অস্থি বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেরও সূত্রপাত করে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, বাংলা ভাষায় অস্থি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ফেলিক্স্ কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮২০), প্রথম ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ পিয়ার্সনের 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপকথন' (১৮২৪), লোসনের 'পশ্বাবলী (১৮২৮) প্রথম

প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ এবং হেরেট্স্ এর 'জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩) প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।[৩] গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়ন বিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বও ইউরোপীয়দের প্রাপ্য। বাংলায় রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম বই 'কিমিয়াবিদ্যার সার', লেখক জন ম্যাক। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে। বইটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'কিমিয়াপ্রভাব' এবং দ্বিতীয়ভাগে 'কিমিয়া বস্তু' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন লেখক। যদিও স্বল্প পরিসরে অধিক তথ্যের সমাবেশের ফলে বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য, তথাপি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রসায়নের বই হিসাবে এটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৪] এইভাবে, ইউরোপীয় লেখকদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সক্রিয় সহযোগিতায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই বাংলায়।

উপরোক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, এদেশে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চা তথা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা—উভয় ক্ষেত্রেই গোড়াপত্তন করার গৌরব ইউরোপীয়দের। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই যেমন ভারতীয়রা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়, ঠিক তেমনই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের দিশারী উদ্যোগ, ভারতীয়কে, বিশেষতঃ বাঙালিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত জড়তা কাটিয়ে তাঁরা কলম ধরার সৎসাহস পান। প্রকাশিত হয় বাঙালি রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'ঔষধসার'। প্রকাশ কাল ১৮১৯। লেখক, রামকমল সেন।[৫] রামকমল সেনের প্রাথমিক প্রয়াসকে আরো বিস্তৃত ভাবে, বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাবার জন্য যাঁরা সক্রিয় হলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য! বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় হিসাবেই রামমোহন রায় রচনা করলেন 'জ্যোগ্রাহী' নামক একটি ভূগোল বই। বইটি ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। কেবল তাই নয়, 'খগোল' নামক একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বই এবং একটি জ্যামিতির বইও লিখলেন তিনি। লিখলেন অল্প সময়ের ব্যবধানে।[৬] রামমোহন রায়ের এই প্রগতিশীল উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হলেন রাধাকান্ত দেব। লিখলেন শিশুপাঠ্য বই 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'। শিক্ষার বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখিত বইটিতে তিনি ভূগোল ও গণিত নিয়েও আলোচনা করলেন। সেই বিচারে, রামকমল সেন থেকে রাধাকান্ত দেব—এই সময়কালে বাঙালির রচিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় একাধিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। কিন্তু, ভাষার কৃত্রিমতা এবং অবশ্যই দুর্বোধ্যতার কারণে উল্লেখিত একটি বইকেও বিজ্ঞান সাহিত্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় না। এই একই কথা প্রযোজ্য পূর্ববর্তী ইউরোপীয় লেখকদের ক্ষেত্রে। সুতরাং, সাহিত্যের রস এবং বিজ্ঞানের সত্য উভয়ের যুগলবন্দীতে যে বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে ওঠে তা আস্বাদনের জন্য বাঙালিকে সাগ্রহে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) আগমনের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ দেশীয় সাজে সজ্জিত করলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করলেন। অক্ষয়-কুমারের এই অক্ষয় কৃতিত্বের হদিশ মেলে শিশির কুমার দাসের নিম্নোক্ত বর্ণনায়,—"বিজ্ঞান রচনায় গদ্যের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর আগে, কিন্তু তিনিই প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানকে আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।...তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল বাংলা বৈজ্ঞানিক গদ্য তথা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন রচনা।"[৭]

পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথ ধরে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার তাগিদে, অক্ষয়কুমার দত্ত যখন কলম ধরলেন, বাংলা ভাষার অবস্থা তখন যে রীতিমত করুণ—তা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনাতেই লক্ষ করেছি। বাংলা ভাষার এই নিতান্ত নাবালক অবস্থায়, গড়পড়তা মনের ভাবপ্রকাশ করাই ছিল কষ্টকর। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুরূহ, জটিল তত্ত্বগুলি সর্বসাধারণের উপযোগী করে উপস্থাপন করা যে প্রায় অসম্ভব কাজ তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। সমসাময়িক বাংলা ভাষার এই সকরুণ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও, অক্ষয়কুমার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাধ্য প্রয়াস নিলেন। অক্ষয়কুমারের এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে প্রশ্ন সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলে তা হল, কেন তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর খুঁজতে গিয়ে, আমরা অপেক্ষমান অপরাপর যে প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হই সেগুলি হল,—বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আবাল্যের অনুরাগই কি তাঁকে এই দুঃসাহসিক দায়িত্ব

গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল? এক্ষেত্রে, সমসাময়িক সময়ের বিদ্বজ্জনের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন? এই ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত কি তাঁর স্বতীব্র স্বদেশপ্রীতিরই পরিচায়ক?

জীবনীকারদের তুলিতে অক্ষয়কুমারের জীবনের যে ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, তাতে প্রথমেই প্রকটভাবে ধরা পড়ে, তাঁর আবালোর অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য ও অনিশ্চয়তা। এর সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে ছিল তাঁর পারিবারিক রক্ষণশীলতা। সব মিলিয়ে শিক্ষা দীক্ষার কোন ইতিবাচক পরিবেশ চুপীগ্রামের এই বালকটির ভাগ্যে জোটেনি। ঘরে বাইরে এই প্রবল প্রতিকূলতা কিন্তু এই বালকটির জ্ঞানার্জনের অদম্য আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। খেলার সাথীকে ভুলে অত্যন্ত ছোটবেলায় সে তাই মেতে উঠেছে পড়াশোনায়। বালক অক্ষয়কুমারের পড়াশোনার প্রতি এই দুর্মর আকর্ষণের বিশেষত: বিজ্ঞানে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—"সাধারণত বালক বয়সে যখন সকলে খেলা-ধূলায় সময় কাটাতে ভালোবাসে, তিনি সে সময়ে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশী। কথিত আছে, কাঠাকালির অঙ্ক কষতে কষতে তিনি পৃথিবীর আয়তন কত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন বার বার।"[৮] বালকের বিজ্ঞানের অজানাতত্ত্বকে জানার এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলাফল—চুপীগ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে, পড়াশোনার আকর্ষণে, দশবছরের বালক অক্ষয়কুমার ১৮৩০ সালে খিদিরপুরে তাঁর আত্মীয় হরমোহন দত্তের বাসায় এসে উঠেছিলেন। কলকাতায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানপিপাসু অক্ষয়কুমার হাতে পেয়েছিলেন জে. ডি. পিয়ার্সনের 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপ-কথন' (১৮২৪) নামক বইটি। ইংরেজি ও বাংলা দ্বিভাষিক এই বইটি পড়েই তিনি চন্দ্রগ্রহণ, সৌরজগৎ, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি বিশ্বকার্যের কারণগুলি বিজ্ঞানসম্মত রূপে প্রথম জানতে পারলেন।[৯] এতদিন, এ বিষয়গুলির পৌরাণিক, লোকপ্রচলিত অলীক ব্যাখ্যাগুলিই মাত্র অক্ষয়কুমারের জানা ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, পিয়ার্সনের উল্লেখিত বইটিতেই অক্ষয়কুমার প্রথম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ পেলেন। ফলত: অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ একলাফে বেড়ে গেল কয়েকগুণ। আর অপ্রতিরোধ্য এই আকর্ষণের কারণেই তিনি ভর্তি হলেন একটি মিশনারি বিদ্যালয়ে। কিন্তু, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হল। বন্ধ করলেন তাঁর অভিভাবকরাই। কারণ,—"His guardians were afraid of the possibility of his conversion into Christianity"।[১০] সুতরাং, বিদ্যালয় বদল। ভর্তি হলেন গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'তে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সেই সময়ে কর্তাব্যক্তি ছিলেন জেফ্রয় হার্ড্যান। বিদ্যোৎসাহী এই ব্যক্তিটির সান্নিধ্যে এসে নানাভাবে উপকৃত হলেন অক্ষয়কুমার। চিন্তাভাবনার উন্নতির সাথে সাথে হাতে কলমে শিখলেন পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়।[১১] কিন্তু, ছাত্র-শিক্ষকের এই সম্পর্ক স্থায়ী হল না বেশিদিন। ষষ্ঠশ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ডাব্‌ল প্রমোশন পাওয়া মেধাবী ছাত্রটির হঠাৎই বিচ্ছেদ হয়ে গেল বিদ্যালয়ের সঙ্গে। পিতা পীতাম্বর দত্তের আকস্মিক মৃত্যুই এই বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। সংসারের বিশাল দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ায়, অত্যন্ত অসময়েই নিয়মিত পড়াশোনা বন্ধ করতে হল তাঁকে। কিন্তু, অক্ষয়কুমারের অদম্য পাঠেচ্ছা তাতে হ্রাস পেল না এতটুকু। বরং নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির বাইরে, স্বাধীন পড়াশোনার সুযোগকে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে, তিনি মেতে উঠলেন বিজ্ঞান চর্চায়। বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের কারণে যিনি পারিবারিক রক্ষণশীলতার শক্ত প্রাচীর ভেঙে ফেলতে পারেন, নিরন্তর দারিদ্র্যের নির্দয় কামড় হাসি মুখে সহ্য করতে পারেন, ওকালতির মত লোভনীয় জীবিকার হাতছানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন, তিনি কি ভাষার কাঠিন্যের ভয়ে হাত গুটিয়ে নিতে পারেন? পারেন না। আর তাই আবাল্যের অদম্য বিজ্ঞান অনুরাগকে খুঁজি করে, অক্ষয়কুমার আত্ম-নিয়োগ করেছেন অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাহসিক কাজে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে গণমুখী করে তোলার মত সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে, অক্ষয়কুমারের আবাল্যের বিজ্ঞানপ্রীতি যেমন মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তেমনি এক্ষেত্রে, সমসাময়িক সময়ের বিদ্বজ্জনেরও একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তদানীন্তন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে, গুরুত্বের বিচারে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভ অক্ষয়জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩০) পত্রিকার জন্য

বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে, গুপ্তকবি প্রায়ই যেতেন অক্ষয়-কুমারের আত্মীয় হরমোহন দত্তের বাড়িতে। এবং সেই উপলক্ষেই তাঁর পরিচয় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে দর্জিপাড়ার 'বাংলা অনুশীলন সভা'কে কেন্দ্র করে, প্রারম্ভিক সেই পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। রামধন বসুর প্রতিবেশী নররানারায়ণ দত্তের বাড়িতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায়, উভয়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বরাহনগরের বাড়িতে 'নীতি রঞ্জিনী' সভায় আরো বলিষ্ঠ হয়।[১২] নীতিরঞ্জিনী সভায় মূলত: নীতিবিষয়ক প্রবন্ধই পাঠ করা হত, এবং নৈতিক উন্নতিসাধনই ছিল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদেই, অক্ষয়কুমার নীতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করেন। পরবর্তী সময়ে গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকরে' এই এই প্রবন্ধগুলির কোন কোনটি প্রকাশিত হয়।[১৩] এইভাবে, গুপ্তকবির ব্যক্তিগত উৎসাহে, আমন্ত্রণেই গৃহবন্দী অক্ষয়-কুমারের মুক্তি মিলেছে। তিনি মেতে উঠেছেন একাধিক সৃষ্টিশীল উদ্যোগে। সমসাময়িক সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসার সুযোগে, তাঁর চিন্তাভাবনার স্তরে ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। কেবল তাই নয়, কলম ধরার সংসাহস পেয়েছেন তিনি। সংবাদ প্রভাকরে প্রবন্ধ প্রকাশ করে গুপ্ত কবিই তাঁকে প্রয়োজনীয় এই সংসাহস যুগিয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের বাংলা গদ্য রচনার হাতে খড়ি হয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছেই। ধারাবাহিক লেখালিখির মাধ্যমে তাঁর কলম যাতে বাংলা রচনায় সাবলীল হয়ে ওঠে, তার জন্য কবি যে অনুক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতেন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক রমাকান্ত চক্রবর্তীর নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণে,—"Isvar Gupta persuaded Akhaya Kumar to practise composition in Bengali prose"[১৪]. কবির সনির্বন্ধ অনুরোধেই অক্ষয়কুমার প্রথম 'Englishman' পত্রিকার কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করেন। সাধারণ-ভাবে এই ঘটনাটি তুচ্ছ হলেও অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনার প্রকৃত চর্চা কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়। সে বিচারে, বাংলা সাহিত্যে ও গদ্যরচনা সম্পর্কে তাঁকে গুপ্ত কবিই শ্রদ্ধান্বিত করে তুলতে নিরন্তর সাহায্য করেছেন। গুপ্ত কবির এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখছেন,—"Iswar Chandra Gupta was then the king of the literary world in Bengal, and Akshay Kumar became acquainted with him. On one occasion, Iswar Chandra asked Akshay to translate an article which had appeard in an English daily paper. 'But I have never composed anything in Bengali prose', said young Akshay, 'how can I translate this?' With his usual kindness for talented youngmen, the veteran Iswar Chandra encouraged him in the task, and admired his performance when it was done. Such was Akshay kumar's initiation into the status of a Bengali writer, and henceforth he began to compose articles for the Probhakar."[১৫] অক্ষয়কুমারের বাংলা গদ্য রচনার নৈপুণ্য অব্যাহত রাখার জন্য, অফুরন্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েই গুপ্ত কবি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। সমসাময়িক সময়ের উদার নৈতিক আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ, 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি অক্ষয়কুমারের সাক্ষাৎও করিয়ে দেন। এ ঘটনার উল্লেখ মেলে মহর্ষির নিজের লেখায়,—"এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়ে দেন। অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন"।[১৬] মহর্ষির সান্নিধ্যে আসার সুযোগে অক্ষয়কুমারের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তাঁর আবাল্য লালিত স্বপ্ন সার্থক হল। পাদ-প্রদীপের আলোয় এলেন তিনি। অনিশ্চয়তার ঘোর কেটে গেল। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন তিনি। আর এইভাবেই বন্ধুকৃত্য পালন করলেন গুপ্ত কবি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার তাৎক্ষণিক ফলা-ফল হিসাবে, অক্ষয়কুমার পেলেন কাঙ্ক্ষিত জীবিকার সন্ধান। ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে, ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যা পড়াবার সুযোগ পেলেন তিনি। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রথম মাসে ৮৲ তৃতীয় মাসে ১০৲ ও তারপরে ১৪৲ টাকা করে মাসিক বেতন পেলেন।[১৭] সংসার সচল রাখার একটা সুরাহা হল। এর পরের ঘটনা শুধুই সাফল্যের অনুক্রমিকা। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের কথা ঘোষণা করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। ঠিক হল, সভাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন পত্রিকা সম্পাদক। নির্বাচনের জন্য

আয়োজন করা হল একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তির মধ্যে সফল হলেন অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারের এই সাফল্যের পরিচয় প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।...গুণের কথা এই যে তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর।"[১৮] অতএব! জন্মমুহূর্ত থেকেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন অক্ষয়কুমার। ফলাফল, একদিকে যেমন তাঁর আয় বৃদ্ধি পেল আশাতীতভাবে, অপরদিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হল। আর এই উভয়ক্ষেত্রেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান যে অনেকখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে, আমরা লক্ষ করি যে, প্রথম পর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও পরবর্তী পর্যায়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিরন্তর সাহায্য, সহযোগিতা ও সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে অক্ষয়কুমারের আশার মুকুলগুলি বিকশিত হয়েছে। সাবলীল বাংলায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যগুলি সর্বসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করার ক্ষেত্রে তিনি আগ্রহী হয়েছেন।

আশৈশব বিজ্ঞান অনুরাগ এবং সমসাময়িক সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছাড়াও অক্ষয়কুমারের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অনুকরণীয় স্বদেশপ্রেমও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সমসাময়িক সময়ের সমাজ-জীবনকে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে, অক্ষয়কুমার এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কুসংস্কারে আপ্লুত এই ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে উদ্ধারের অন্যতম উপায়—বিজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রচার। জাতীয় এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে, আমজনতার বোঝার সুবিধার কথা মাথায় রেখে, তিনি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাংলা ভাষাকে। অবশ্য, বাংলা ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৪৩ সালের ৩০ এপ্রিল বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্বোধন উপলক্ষে অক্ষয়কুমার যে বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে দিয়ে জাতীয় প্রয়োজনে বিজ্ঞান চর্চার আশু প্রয়োজনীয়তার কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রদত্ত এই বক্তৃতার অংশ বিশেষে তিনি বলেন,—"আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খৃষ্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয়, কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণ ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না,—তাঁহার দিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, হিন্দুনাম ঘুচিয়া আমার দিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং ভঙ্গভায়ায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শক ১৮ই বৈশাখ রবিবার অতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।"[১৯]

বাংলা তথা ভারতের জাগরণ যুগের অন্যতম বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার। তাঁর কর্ম ও চিন্তা জগতের সীমা ও সিদ্ধি এই নবজাগরিত বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতীয় মুক্তিতে জ্ঞান চর্চার স্থান সর্বাগ্রে, বিজ্ঞানানুশীলন মানুষের সর্বার্থসাধক প্রয়োজন—অক্ষয়কুমার তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক অক্ষয়কুমার তাই পররাজ্যলোভী, প্রজাপীড়ক ইংরেজ শাসকবর্গের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর এই বিক্ষোভ প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব কলমেই,—"কতিপয় ইংরাজ জাতীয় রাজকর্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্যন্ত কেবল সহায় বলে ও বুদ্ধি কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ছিলেন, এক্ষণে ধর্মপুস্তকের স্বারূপ্যপদও জ্যোতিঃ সহ করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।"[২০] উপরোক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নিদারুণ ক্ষোভের নীরব জবাব হিসাবেই অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আজীবন বিজ্ঞান প্রচারে অক্লান্ত থেকেছেন।

কেন বা কী কারণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মত সাহসী সিদ্ধান্ত অক্ষয়কুমার গ্রহণ করেছিলেন তা আলোচনার পর, এখন দেখা দরকার, বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তোলার জন্য অক্ষয়কুমার কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন? এবং সেক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায়? অন্য

অর্থে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর অনন্ততা প্রকট হয়ে উঠেছে? উল্লেখিত প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর সন্ধানের জন্য, অক্ষয়কুমারের আজীবন বিজ্ঞান সাধনাকে আমরা মূলতঃ তিনটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। যেমন, সমসাময়িক সময়ের পত্র পত্রিকায়, বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ে তথ্য নিষ্ঠ একাধিক গ্রন্থ রচনা। এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে দেশীয় জনগণের সম্যক পরিচয় করাবার যে দৃঢ় সংকল্প অক্ষয়কুমার গ্রহণ করেছিলেন, তা সার্থক হয়ে ওঠে সুযোগ্য সাথী হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে পাওয়ার ফলে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শুভ সূচনা হয়। কেবল সূচনাই নয়, পরবর্তী ১২ বৎসর (১৮৪৩-১৮৫৫) অক্ষয়কুমারের সুযোগ্য সম্পাদনাতেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র হিসাবে সমাদৃত হয়। অক্ষয়কুমারের প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিপুল জনপ্রিয়তার হদিশ দিতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন,—"তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্যের উপযোগী যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল।"[২১] শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরোক্ত বক্তব্যেরই অনুসরণ লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের লেখায়,"...People, all over Bengal, awaited every issue of that paper with eagerness, and the silent and sickly but indefatigable worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal."[২২]

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সূচনা করে একটি নূতন ধারার। এই নূতন ধারাটি হল, ভাষার ক্রত্রিমতা ঘুচিয়ে নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ। পূর্ববর্তী সাময়িকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' তথা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সমসাময়িক অপরাপর পত্রিকা যেমন, পক্ষীর বিবরণ, সত্যপ্রদীপ, সত্যার্থব, বিবিধার্থসংগ্রহ, সুলভপত্রিকা, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা, বিদ্যাদর্শন প্রভৃতিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, উল্লেখিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধের ভাষাই ছিল জটিল ও কৃত্রিম। এবং অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল প্রাথমিক প্রকৃতির রচনা। সে অর্থে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই সর্বপ্রথম জড়তাহীন, প্রাঞ্জল ভাষায় সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কেবল তাই নয়, বিজ্ঞানের বিবিধ দিক নিয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই প্রথম প্রকাশ করে। সাবলীল বাংলা ভাষায় ধারাবাহিকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে নবযুগের সূচনা করে—তার প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই এককভাবে অক্ষয়কুমারের প্রাপ্য।

অক্ষয়কুমারের 'সিন্ধুঘোটক' (১লা আশ্বিন ১৭৬৭) নামক প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমেই তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে 'বনমানুষ' (মাঘ ১৭৬৭), 'বীবর' (শ্রাবণ ১৭৭৪) নামক প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে অক্ষয়কুমারই স্বযত্নে সে ধারা বজায় রেখেছেন। তাঁর কলমের জোরেই প্রাণীবিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি প্রাণময়, সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কেবল প্রাণীবিজ্ঞান নয়, তত্ত্ববোধিনীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম রচনার অনন্য কৃতিত্বও অক্ষয়কুমারেরই। ১৭৬৯ সালের আষাঢ় মাসে 'সৌরজগৎ' নামক প্রবন্ধটিই 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রাণীবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতই বাংলা সাহিত্যে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনারও নবযুগের সূচনা হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। ১৭৭৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে শুরু হয় এই নূতন ধারার। শুরু করেন অবশ্যই অক্ষয়কুমার। 'পদার্থবিদ্যা' এই শিরোনামে তিনি জড় ও জড়ের গুণ, শক্তি, বেগ, গতি, ভারকেন্দ্র, পেণ্ডুলাম ও বারিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীতে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এধরনের সারগর্ভ অথচ সরল রচনা, পূর্বের পত্রপত্রিকাগুলিতে লক্ষ করা যায় না। ফলতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে আশাতীত ভাবে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার পিছনে, অক্ষয়কুমার লিখিত সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির ভূমিকা যে অশেষ, তা সহজেই অনুমেয়।

জনপ্রিয় পত্রিকায় সহজ, সরল বাংলা ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার যেমন বিজ্ঞানকে জনমুখী করার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তথ্য সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনাতেও উৎসাহী হয়েছেন। বিশ্বকার্যের কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত ছোট বেলাতেই যে অক্ষয়কুমার অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন—তা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ করেছি। আবাল্যের এই অনুসন্ধিৎসার সুনিশ্চিত ফলাফল—তাঁর প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'ভূগোল' (১৮৪১)। বিজ্ঞাননিষ্ঠ লেখক তাঁর ভূগোল গ্রন্থে বিশ্বকার্যের বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যা করলেন অত্যন্ত মনোরমভাবে। পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গোলত্ব, জলস্থলের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধর্ম ও ভাষা নিয়ে এ ধরনের বিস্তৃত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পূর্ববর্তী কোন লেখকের রচনাতে লক্ষ করা যায় না। ভাষার মাধুর্যে ও পরিবেশন নৈপুণ্যে উল্লেখিত গ্রন্থটি যে সমসাময়িক সময়ের অপরাপর গ্রন্থের থেকে অনেকটাই পৃথক, তা প্রকট হয়ে ওঠে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণনায়,—"বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনার যতখানি প্রভেদ, তদপেক্ষা এই ভূগোল অনতিপূর্বে প্রকাশিত যে কোন গদ্যগ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী।"[২৩] 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩) অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগ ১৮৫১ এবং ২য় ভাগ ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের ধর্ম ও বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আত্মিক পরিচয়। কেবল বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানব সংসারের সম্পর্কের কথা নয়, মানবাত্মার বিকাশের কথাও এ গ্রন্থের উপজীব্য।—জ্ঞান ও কর্ম, প্রকৃতি ও মানুষ, বিজ্ঞান ও জিজ্ঞাসা এবং ধর্মসাধনা দুই-ই মানবজীবনের অপরিহার্য বিষয়। অন্তর ও বহির্বিশ্বের সাম্যতেই মানবজীবনের পূর্ণতা। 'বাহ্যবস্তু' এই পরিপূরকতা, এই পূর্ণতার গ্রন্থ। গ্রন্থটিকে সুচারুরূপে পাঠোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে লেখক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্বিক সাহায্য পেয়েছিলেন। গ্রন্থারম্ভে লেখক সে বিষয়ের উল্লেখ করে লিখেছেন,—"অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালি (ভূ) বিচক্ষণ ব্যক্তি, গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।"[২৪] উল্লেখিত গ্রন্থটি যে তদানীন্তন বাঙালি, বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের উপর, সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনায়,—"১৮৫১ সালে ও ১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের এক নবযুগের অবতারণা হইল। বিশেষতঃ 'বাহ্যবস্তুর' প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্রচারেনাতে অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন ; এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।"[২৫]

তথ্যাকীর্ণ, সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় কুমার সহজ, সরল এবং অবশ্যই সরস শিশুপাঠ্য রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টারই প্রকাশ 'চারুপাঠ।' মোট ৫৭টি রচনার মধ্যে ৩৪টিই বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা। প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতি-বিজ্ঞার বিবিধ বিষয় উল্লেখিত ৩৪টি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই রচনাগুলিতে লেখক সরল ভাষায়, সহজ করে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করেছেন। উদাহরণ হিসাবে 'চারুপাঠ', প্রথম ভাগে 'আগ্নেয়গিরি' রচনায় আগ্নেয়গিরির ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়। আগ্নেয়গিরির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অক্ষয় কুমার লিখছেন,—"কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উফ্ফল ও ধাতু নিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হয়। এই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় পর্ব্বত।"[২৬]

অক্ষয় কুমারের অন্যতম বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক 'পদার্থ-বিদ্যা'। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১৮৫৬। বাংলায় সুপরি-কল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান রচনার সার্থক প্রয়াস এই পুস্তকেই প্রথম পাওয়া গেল।[২৭] জড় ও জড়ের গুণ, বিস্তৃতি, স্থিতি-বিরোধ, পরমাণু, আকৃতি, মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, চৌম্বক, তড়িতাকর্ষণ, তেজ, পরিচালকতা, কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, গতি, শক্তি প্রভৃতি পদার্থের সত্তাব্য সকল প্রকার গুণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক উল্লেখিত গ্রন্থটিতে।

এক্ষেত্রে, উদাহরণ হিসাবে লেখক প্রদত্ত জড়ের সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়। জড়ের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার লিখছেন,—"যে গুণ থাকিতে, জড় পদার্থ আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং অন্য কর্তৃক চালিত হইলে, আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না, তাহার নাম জড়ত্ব।"[২৮] এইভাবে, জড় ও জড়ের গুণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের অপরাপর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার উৎস মুখ উন্মুক্ত করলেন। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও জ্যামিতি নিয়েও একটি গ্রন্থ রচনা করেন অক্ষয় কুমার। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়নি।[২৯] 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'চারুপাঠে'র মধ্যে দিয়ে অক্ষয়কুমার একদিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় করে তুললেন, অপর দিকে তেমনিই 'ভূগোল' ও 'পদার্থ বিদ্যায়' পথ দেখালেন সুপরিকল্পিত ও সারগর্ভ বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায়।

সাময়িক পত্রে সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তথা তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার মতই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নেও অক্ষয়কুমারের অনন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমারের আগেই বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে পরিভাষার ব্যবহার শুরু হয়। এক্ষেত্রে, পথপ্রদর্শকের ভূমিকাটি গ্রহণ করেন ফেলিক্স কেরী। তাঁর রচিত 'বিদ্যাহারাবলী' ১ম খণ্ড (১৮২০) নামক গ্রন্থেই যে প্রথম পরিকল্পিত পরিভাষা লক্ষ করা যায়, তার সাক্ষ্য মেলে সজনীকান্ত দাসের লেখায়,—"তিনি (ফেলিক্স কেরী) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথ প্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ম্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে।"[৩০] কেরীর পথ অনুসরণ করে পরবর্তী সময়ে ইয়েটস্, ফার্গুসন, জন ম্যাক প্রভৃতি ব্যক্তিরা তাঁদের বিজ্ঞান গ্রন্থেও প্রয়োজনীয় পরিভাষার ব্যবহার করেন। কিন্তু, বাংলা ভাষায় এতগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া স্বত্ত্বেও, আমরা লক্ষ করি যে, ১৮৫৬ সালে 'পদার্থ বিদ্যা' প্রকাশকালে অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব বোধ করেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা নিম্নোক্ত পত্রটির অংশ বিশেষে তাঁর এই অভাব বোধ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে,—"পদার্থবিদ্যা সমাপ্ত হইলে আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষায় শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যাসাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই, যেরূপ বলবীর্য্য বিহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায়না।"[৩১] অক্ষয়কুমারের এই অভাব বোধের প্রথম কারণ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি তখনও সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত না হয়ে ওঠা। এক্ষেত্রে, অপর কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের নিজস্ব নিয়মগুলি অনুসরণ না করার কথা উল্লেখ করা যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির এই অপরিহার্য নিয়মগুলি নিম্নরূপ :—

ক. যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ স্পষ্ট তাৎপর্য্য থাকে।

খ. প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না।

গ. নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়।

ঘ. নূতন শব্দ প্রণয়ন করিতে হয়।[৩২]

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে পরিভাষা সৃষ্টির এই অপরিহার্য নিয়মগুলি, অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন। সেই কারণেই, বাংলা ভাষার পারিভাষিক শব্দের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে, উদাহরণ হিসাবে অক্ষয়কুমারের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরি-ভাষার উল্লেখ করা যায়। যেমন, Planet-গ্রহ, Compass-দিগ্‌দর্শনযন্ত্র, Law of attraction-মাধ্যাকর্ষণশক্তি, Chemistry—রসায়নবিদ্যা, Physiology—শরীরবিদ্যা, Electricity-তড়িৎ, Analysis-ব্যবচ্ছেদ, Meterology-মানমন্দির প্রভৃতি। বস্তুত, অক্ষয়কুমার তাঁর রচনায় যত বেশি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, উনবিংশ শতকে একজন গদ্য লেখক, ঠিক তত বেশি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে অসংখ্য সুপরিকল্পিত পরিভাষা প্রণয়নের মাধ্যমে, অক্ষয়কুমার যে বাংলা ভাষায় গদ্যের একটি বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দীনেশচন্দ্র সেনের সশ্রদ্ধ মন্তব্যে, "In the field of a pure Scientific style his was tho model which remained almost unrivalled till only lately Ramendra Sundar Trivedi and his colleage—Jagadananda improved upon it by coining Bengali technical words from classical sources, so needed for the development of our scientific literature. Aksay

Kumar Dutta in the field did the pioneer work which must be gratefully acknowledged by all."[৩৩]

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমারের বিবিধ দিশারী উদ্যোগ আলোচনার পর, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল, একক উদ্যোগে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে তিনি যে নূতন ধারার সৃষ্টি করলেন, তা সম সময়কে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ? অন্য অর্থে, অক্ষয়কুমার সৃষ্ট সেই ধারাটি রক্ষায় সম সময়ের অপরাপর বিজ্ঞান লেখকরা কতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন ?

তদানীন্তন সময়ের পর্যালোচনায় এ প্রশ্নের যে সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যায় তা অবশ্যই অস্তিবাচক। মুষ্টিমেয় হলেও বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে অক্ষয়কুমার সৃষ্ট ধারাকে অব্যাহত রাখতে, তাঁর সমসাময়িক সময়েই বাঙালিরা উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে গণমুখী করে তুলতে কলম ধরেছেন। উদ্যোগী এই বাঙালিদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-১৮৮৫) অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আশৈশব আগ্রহের কারণেই তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহী হয়েছেন। রচনা করেছেন 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র মত সুবিখ্যাত গ্রন্থ। তের খণ্ডে বিভক্ত 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' লেখক মূলতঃ জ্যামিতি ও ভূগোল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট জ্যামিতি রচনার তিনিই ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক। পরবর্তী যুগের অনেক প্রখ্যাত জ্যামিতিকারও কৃষ্ণমোহন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্যামিতি রচনা করতে পারেন নি।[৩৪] জ্যামিতি ছাড়াও, রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেন তিনি।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অপর যে ব্যক্তির নাম সমুচ্চারিত হয়, তিনি হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৭১)। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ভূগোল বিজ্ঞানে। 'প্রাকৃত-ভূগোল অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণনা বিষয়ক' গ্রন্থে (১৮৫৪) রাজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল রচনার সূচনা করেন। ভূগোলের প্রতি তাঁর সুতীব্র আকর্ষণের কারণেই একদিকে তিনি যেমন বাংলায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা করেছেন তেমনি অপরদিকে, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা ভাষায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন। ভূগোলের বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্যেই রাজেন্দ্রলাল তাঁর উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার তাগিদে, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদনার গুরু দায়িত্বও পালন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর সুসম্পাদনাতেই উল্লেখিত দু'টি সাময়িক পত্র অতি অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেবল তাই নয়, উল্লেখিত দু'টি পত্রিকাতেই প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সরস বিজ্ঞানালোচনাগুলি, বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ জনগণের আকর্ষণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের অবদান নিহিত রয়েছে এখানেই।

আজীবন সাধনার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর, তাতে সার-সংযোজন করে সমৃদ্ধ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের কারণেই শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের কাছে, বিজ্ঞানকে সমসময়ই তিনি আকর্ষণীর করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। আর সে কারণেই প্রাণিতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় সহজ ও সরস করে তুলে ধরেছেন ছাত্রদের কাছে। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ সৃষ্টি করেই ভূদেববাবু তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। অগণন বাঙালিকে বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করে তুলতেও সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁর এই সচেষ্টতার সাক্ষ্য বহন করছে 'প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ' নামক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থটি। উল্লেখিত গ্রন্থটির ২য় ভাগটিই প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৮৫৯। প্রকাশিত ২য় ভাগে লেখক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিচার করবারও সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও বিষয়ের দুরূহতা লাঘবের উদ্দেশ্যে লেখক সাহায্য নিয়েছেন সরস উপমার। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া ভূগোলের প্রতিও ভূদেববাবুর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভূগোলের প্রতি সবিশেষ অনুরাগের কারণেই 'গয়া কি ভূগোল' নামে হিন্দিতে একটি বই রচনা করেন। এইভাবে, বিবিধ উদ্যোগের মাধ্যমে বাঙালিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করে তুলতে ভূদেববাবু

আজীবন অক্লান্ত ছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের সমসাময়িক তিনজন বিজ্ঞান মনস্ক বাঙালির বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আলোচনার মধ্যে দিয়ে, তদানীন্তন সময়ের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপর তাঁর সবিশেষ প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বস্তুতঃ তৎকালীন সময়ের অপরাপর বিজ্ঞান লেখকদের কাছে অক্ষয়কুমারের বিস্তৃত কর্মময় জীবনই হয়ে উঠেছিল অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর অনুসৃত পথ ধরেই বিজ্ঞান চর্চায় ব্রতী হয়েছেন অপরাপর ব্যক্তিরা। ফলতঃ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের সৃষ্ট নূতন ধারাটি সযত্নে কেবল রক্ষিতই হয়নি, সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে তা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ধীরে হলেও বাঙালির মধ্যে গড়পড়তা বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সব মিলিয়েই সিদ্ধিলাভ করেছে অক্ষয়কুমারের সাধনা। সার্থক হয়ে উঠেছে কবির বাণী,—

"বিজ্ঞান সাহিত্যে শোভে তোমার লেখায়,
অক্ষরের অক্ষয় কীর্ত্তি পুণ্য বাঙ্গালায়।"[৩৫]

তথ্যসূত্র :

১ B. D. Basu, History of Education in India, under the East India Company, Calcutta, 1935, pp. 7-8. বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য 'Friend of India', May 20th, 1841 p. 305 দ্রষ্টব্য।

২ রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৮৯৭, পৃঃ ৩৭-৩৯।

৩ নবেন্দু সেন, গদ্য শিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৬৯-৭০।

৪ উইলিয়াম কেরী, ওরিয়েণ্টাল ফিশ্‌ক্রিপ্টান বায়োগ্রাফি, পৃ. ২৮৫।

৫ নবেন্দু সেন, পৃ. ৭০।

৬ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, কলিকাতা, ১২৮৭, পৃ. ৪০৭।

৭ নবেন্দু সেন, গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুখবন্ধ' শিশির কুমার দ্বাস, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৩।

৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ১২ সংখ্যা, পৃ. ৫-৬।

৯ নবেন্দু সেন পৃ. ৬

১০ Amal Kumar Mukhopadhyay (Ed), The Bengali Intellectual Tradition from Rammohun Roy to Dhirendranath Sen, "Aksayakumar Datta: The First Social Scientist", Ramakanta Chakraborty, Calcutta, 1979, p. 38.

১১ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৮৮৫-৮৬, পৃ. ৭।

১২ নবেন্দু সেন, পৃ. ৮।

১৩ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, পৃ. ১৩-১৮।

১৪ Amal Kumar Mukhopadhyay (Ed), The Bengali Intellectual Tradition: From Rammohun Roy to Dhirendranath Sen, "Aksaya Kumar Dutta: The First Social Scientist", Ramakanta Chakraborty, Calcutta, 1979, pp. 38-39.

১৫ R. C. Dutta, Cultural Heritage of Bengal, Calcutta, pp. 106-107,

১৬ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী ; কলিকাতা পৃ. ২৬।

১৭ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (চতুর্থ মুদ্রণ) কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ. ১৮০

১৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলিকাতা, পৃ. ৩৬।

১৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১লা আশ্বিন, ১৮৪০ (১৭৬৫ শক) পৃ. ১১-১২।

২০ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, স্বপ্নদর্শন, ৩য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৫৯, পৃ. ৯০।

২১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালী বঙ্গসমাজ, (চতুর্থ মুদ্রণ) কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮০।

২২ R. C. Dutta, The Literature of Bengal, Calcutta, 1877, pp. 163-164.

২৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, ৩য় ভাগ, 'ভূমিকা', সতেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ১৮৫৯, পৃঃ ১৩।

২৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ১ম ভাগ, 'ভূমিকা', কলিকাতা, ১৮৫১, পৃ. ৮-৯।

২৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (চতুর্থ মুদ্রণ) কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৯।

২৬ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৫৩. পৃ. ৬।

২৭ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয় চরিত, কলিকাতা, পৃ. ৩২।

২৮ অক্ষয়কুমার দত্ত, পদার্থবিদ্যা, কলিকাতা, ১৮৫৩, পৃ. ১৩।

২৯ অক্ষয়কুমার রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ. ৩৬।

৩০ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৮ন খণ্ড, ৮৮ সংখ্যা, পৃ. ১৭-১৮.

৩১ প্রবাসী, ৪ ভাগ, ১ : সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৯০৪।

৩২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', রামেন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৯৫০, পৃ. ১৩৭।

৩৩ D. C. Sen, Bengali Prose Style, Calcutta, 1921, p. 141.

৩৪ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৯।

৩৫ ললিতচন্দ্র মিত্র, 'জন্মভূমি', অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

প্রসঙ্গ ঃ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের জলপাইগুড়ি এবং রাজনীতির চার দশক

সুনীল সেন

দশ বছর আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্ত যে পেপার পড়েন, তাকে ভিত্তি করে ইকনমি, সোসাইটি অ্যাণ্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল : জলপাইগুড়ি ১৮০৭-১৯৪৭ বইটি লিখিত। ইতিমধ্যে তিনি সংগ্রহ করেছেন বিচিত্র তথ্য ; বেশির ভাগ তথ্য দিল্লী এবং পশ্চিমবঙ্গের মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত। গ্রন্থপঞ্জি তার স্বাক্ষর বহন করে। কয়েকটি অধ্যায়ের আলোচনা একটু কেমানো মনে হতে পারে—সম্ভবত লেখক বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্যে সচেষ্ট ; দীর্ঘ লেখায় তাঁর ক্লান্তি নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পটভূমি ব্রিটিশ মূলধনে পরিচালিত চা-বাগিচা শিল্প। এই অধ্যায়টি তথ্যসমৃদ্ধ। স্টার্লিং কোম্পানির তালিকা দেখে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ডুয়ার্সের চা-বাগিচা শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল ; চা বাগানগুলি পরিচালনা করত ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস, যেমন ডানকান ব্রাদার্স, উইলিয়মসন ম্যাগোর, ড্যাভেন পোর্ট। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ডুয়ার্সের চা-শিল্পে বাঙালি পুঁজি বিনিয়োগ। বাঙালি উদ্যোগের পুরোভাগে ছিল মুনসি রহিম বকস, ভগবান চন্দ্র বোস প্রমুখ ; প্রায় সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং শহরবাসী। ১৯০৭ সালে বাঙালিদের দখলে ছিল ৪৭টি চা-বাগান ; মালিকদের মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু প্রায় সমান সংখ্যক। চা-বাগানের শেয়ার কিনে অনেকে বিত্তবান হয়েছিলেন।

ডুয়ার্সের চা-বাগানে নেপালি শ্রমিক থাকলেও বেশির ভাগ এসেছিল ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে। কিন্তু কেন এরা গ্রাম ছেড়ে চা-বাগানে এসেছিল ? পার্শিভাল গ্রিফিথস মনে করেন যে মালিকরা আসামের মত জোরজবরদস্তির ("ইনডেনচার সিস্টেম") আশ্রয় নেয়নি, কেননা চা-বাগানের নিকটবর্তী অঞ্চল ছিল ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা। এই যুক্তি ঠিক পরিষ্কার নয়। মনে হয় যে গ্রামের জীবন এদের কাছে সুখের ছিল না, একটু ভাল ভাবে বাঁচবার আশায় এই আদিবাসী কৃষকরা চা-বাগানে মজুর হয়ে এসেছিল। সরকারি প্রতিবেদনে আছে, সমগ্র পরিবার, স্বামী, স্ত্রী এবং শিশু সন্তান, বাগানে নিযুক্ত হত।

শ্রীদাশগুপ্ত স্বভাবতই ভূমি-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। জোতদারি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ভূমি-ব্যবস্থা। বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক খাজনা দিতে হত ; ধান উঠত জোতদারের গোলায়। আশ্বিন, কার্তিক মাসে কর্জা ধানের জন্য আদিয়ার জোতদারের কাছে বাঁধা থাকত। এই পটভূমিকায় ১৯৩৯-এ বর্গাদারদের আন্দোলনে ধ্বনি ছিল, "নিজ গোলায় ধান তোল", "কর্জা ধানের সুদ নাই"। সেদিনের সেই আন্দোলনের পরিণতি ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা সংগ্রাম। এ যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

ডুয়ার্সে আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মূলে ছিল উপজাতীয় সংহতি। আদিবাসীরাই ছিল মজুর ও বর্গাদার। অবশ্য দেবীগঞ্জে মুসলমান বর্গাদারের সংখ্যা ছিল বিপুল। এই অঞ্চলেই চারু মজুমদারের রাজনীতিক জীবনের শুরু। কিন্তু ডুয়ার্সে অবস্থা ছিল অন্যরকম। মুসলমান জোতদার থাকলেও, বর্গাদারদের বেশির ভাগই ছিল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা। জাতিগত বাধা বিশেষ ছিল না।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের বিবরণ দিয়েছেন শ্রীদাশগুপ্ত। কিছু কাল তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাছে থেকে তিনি কৃষককে দেখেছিলেন। এর মূল্য অশেষ। তাই তাঁর চোখে রেল শ্রমিকদের অবদান ধরা পড়েছিল। ডুয়ার্সের রেল-শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটলবাবু) ; তাঁর সহকারী ছিলেন পরিমল মিত্র এবং বিমল দাশগুপ্ত। তাঁদের কাজের ফলশ্রুতি তেভাগার দাবির সমর্থনে আদিবাসী শ্রমিকদের মিছিল। একটি বিখ্যাত সরকারি প্রতিবেদনে এই ঘটনা উল্লিখিত : "…bands of labourers had left their work and headed by Communist leaders, were roaming the coutryside…in support of a general demand by the ryots of the district for a two-thirds share of the paddy crop…"

তেভাগা সংগ্রাম ব্যাপক ছিল উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়িতে। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা পরিক্রমা করে স্টেটসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছিলেন : "বিগত শতকের পর শতক মূক ছিল সে ; আজ এক শ্লোগানের চিৎকার ধ্বনিতে সে রূপান্তরিত। সঙ্গীদের নিয়ে সে মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলেছে, প্রত্যেকের হাতে রাইফেলের মত করে ধরা লাঠি, মিছিলের পুরোভাগে একটি লাল ঝাণ্ডা। এ দেখে অনুপ্রাণিত হতে হয়। বাঁশঝাড়ের নৈঃশব্দের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের কাছে তুলে তারা যখন নিচুস্বরে 'ইনকিলাব কমরেড' বলে, তা শুনে কেমন ভয় ভয় করে।…"

অবিভক্ত বাংলার উনিশটি জেলায় তেভাগা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়লেও একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় শ্রমিক-কৃষকের মিলিত সংগ্রাম বিকশিত হয়েছিল ডুয়ার্স অঞ্চলে। শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, সংগ্রামের ঘাঁটিগুলিতে "parallel political authority" গড়ে উঠেছিল। বর্তমান লেখকের তেভাগা সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার এলাকা ছিল ঠাকুরগাঁও মহকুমা। সংগ্রাম তুঙ্গে উঠলেও তাকে মূলত আংশিক সংগ্রাম হিসেবে দেখা হয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে নেহরু সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কৃষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। সেদিনের সেই প্রচেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। যতদূর জানি, জলপাইগুড়ি জেলাতেও ১৯৪৭-এ আংশিক সংগ্রাম হিসেবে ডুয়ার্সের সংগ্রামকে দেখা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে ডুয়ার্সের সংগ্রাম দ্রুত ভেঙে পড়েছিল সরকারি দমননীতির মুখে। তার একটি কারণ অবশ্য এই যে বাংলা দেশের সর্বত্র তেভাগা সংগ্রামের পশ্চাদাপসারণের বিষণ্ণ পর্ব শুরু হয়েছিল।

ডুয়ার্সের আন্দোলনে আদিবাসী মেয়েদের ভূমিকা, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা উল্লেখ করা উচিত। শ্রীদাশগুপ্ত কয়েকজন মহিলা ক্যাডারের কথা লিখেছেন, যেমন বুনি ওরাওঁনি, যমুনা ওরাওঁনি, পোকো ওরাওঁনি। কিন্তু ইউনিয়ন মহিলা ক্যাডারদের পাদপ্রদীপের সামনে আনার চেষ্টা করেনি ; ইউনিয়ন সত্যিই ছিল "পুরুষের দুর্গ" ("male bastion")। স্বভাবতই আদিবাসী মেয়েরা অদৃশ্য থেকে গেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে এটা দৈবাৎ ঘটনা নয়। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা বর্তমান লেখকের আই. এল. ও. র সাহায্যপ্রাপ্ত প্রজেক্টের প্রতিবেদন দেখতে পারেন (S. K. Sen, The Working Women, in T. Muntemba, ed. Rural Development and Women, vol II, ILO, Geneva, 1985).

পরিশেষে একটি বিষয় না বলে পারছি না। ১৯৪৮-৪৯ সালে দেবীগঞ্জে কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদল মুসলমান ক্যাডার দেখেছিলাম। সম্ভবত এর পেছনে আছে চারু মজুমদারের ক্যাডার তৈরির প্রচেষ্টা। শ্রীদাশগুপ্ত শুধু বাচ্চা মুনসির নাম করেছেন। সে কিন্তু আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে যায়। আমাকে সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল যারা তাদের একজনের কথাও এই বইয়ে নেই। হায়, তাদের নাম আমিও ভুলে গেছি। কিন্তু আমৃত্যু তাদের কথা মনে গেঁথে থাকবে।

'চার দশকের ভাবনা' বইটির লেখক শ্রীহীরেন দাশগুপ্ত স্কুলে পড়বার সময় রাজনীতি শুরু করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসেবে তিনি ছাত্র ফ্রন্টে কাজ করেন। তাঁর বইতে অনেক বিষয় আলোচিত হলেও বইয়ের প্রধান আকর্ষণ ছাত্র আন্দোলনের বিবরণ। হীরেনের প্রায় চার দশক কেটেছে ছাত্র আন্দোলনে। ষাটের দশকে তিনি সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তখন তিনি থাকতেন দিল্লীতে। সেই সময় পি. সি. যোশির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। সত্তরের দশকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং আংশিক সময়ের রাজনীতিক কর্মী হন।

জাতীয় আন্দোলনের মধ্য থেকে ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ। ১৯০৫, ১৯২৬, ১৯৩৯ সালে জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকা সাধারণ ভাবে পরিচিত। ১৯৩৬ সালে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতির পতাকাতলে দলমত নির্বিশেষে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হলেন। সকল দলের প্রতিষ্ঠান ছিল ছাত্র ফেডারেশন। অবশ্য নেতৃত্ব ছিল সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের হাতে। এই পর্বের আলোচনায় দুটি বিষয় বাদ পড়েছে। এক, ১৯৪২-৪৩এর জনযুদ্ধ পর্বে ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা কী ছিল ? জনযুদ্ধের পর্বে জাতির প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল ? দুই, ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা কী ছিল ? তিনি কি এই পর্বে ছাত্র ফেডারেশনের অনুসৃত নীতি সমর্থন করেন ?

ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট দিয়ে তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালের

কালপর্বের "অগ্নিগর্ভ" দিনগুলির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি সপ্তাহ পালন, রসিদ আলি দিবস, ভিয়েতনাম দিবস ইত্যাদি। বোমবাইতে রাজকীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ দেশের বিপ্লবী পরিস্থিতির দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে। এই পর্বেই তেভাগা ও তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রাম। দুঃখের বিষয়, অ-কমিউনিস্ট বামদলগুলি, বিশেষ করে আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লক, তখন সাম্যবাদ-বিরোধী "সংগ্রামে" নিমগ্ন ছিল। এদের হাতে নিহত হন "ইঁদুর" গল্পের লেখক সোমেন চন্দ। তিনি একটি শ্রমিক মিছিল পরিচালনা করছিলেন। প্রহৃত হন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি এবং স্নেহাংশু আচার্য। মৈমনসিংহে খুন হন কণী চক্রবর্তী। ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যায় স্টেনগান ব্যবহৃত হয়। শ্রীদাশগুপ্ত এই পর্বের সরকারি রিপোর্ট, বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট, দেখেননি। তাতে এই দলগুলির ভূমিকা উল্লিখিত। ছাত্র ফেডারেশনের ঐক্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আর. এস. পি. ও ফরওয়ার্ড ব্লক সেদিন কমিউনিস্ট ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হলে গণজাগরণের সেই পর্বে ছাত্র সমাজের ভূমিকা আর একটু উজ্জ্বল হত।

স্বাধীনতার পর দেশের রাজনীতির অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্যাসিস্টদের পতনের পরে আন্তর্জাতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। ছাত্রসমাজের মধ্যে দেখা গেল নতুন চেতনা। শ্রীদাশগুপ্ত ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর মতে, ছাত্র ফেডারেশনের প্রধান কাজ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে উপলব্ধি। তিনি লিখেছেন, "দলীয় রাজনীতির স্থান" ছাত্র ফেডারেশনে নেই, ছাত্রদের তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, "ছাত্ররা খেলতে চায়, চায় কবি হতে, চায় গায়ক হতে।" বর্তমান অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। সমস্ত ছাত্রের মিলিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন ; কোন রাজনীতিক দলের সম্পত্তি নয়। সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে শ্রীদাশগুপ্ত সতর্ক থাকতে চান।

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় বক্তব্য (সেণ্ট্রাল থিম) খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। একটা বিষয়ে না বলে পারছি না। তিনি যেন মৌলিক তথ্য (আর্কাইভাল ম্যাটেরিয়াল) দেখেন। তাহলে তাঁর লেখা আরও সমৃদ্ধ হবে।

ইকনমি, সোসাইটি অ্যাণ্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল : জলপাইগুড়ি ১৮০৯-৯৯৪৭—রণজিৎ দাশগুপ্ত / অকসফোর্ড / মূল্য ২৮০ টাকা।

চার দশকের ভাবনা—হীরেন দাশগুপ্ত / উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা / মূল্য ৮০ টাকা।

গ্রামীণ বিকাশের সমস্যা এবং 'কুমিল্লার আদর্শ'

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থের লেখক তাঁর বিষয় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। গ্রামীণ বিকাশ ও সমবায়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। তাছাড়া, সাধারণ প্রশাসন, বিকাশ প্রশাসন, কর্মচারী প্রশাসন এবং আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা সুবিদিত। তিনি একাধারে একজন প্রশাসক ও শিক্ষাবিদ্। ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ লোকাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠানটির তিনি ডাইরেক্টর-জেনারেল। ডঃ দাশ এই গ্রন্থে মূলত বিকাশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও পরিধি সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য ও বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থের মূল অংশ চারশ চুরাশি পাতায় এবং তার সঙ্গে তিনি নানা তথ্যসমৃদ্ধ সংযোজন (appendices) যুক্ত আরও একশ আশি পাতার মত।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সব দেশই সর্বাঙ্গীণ আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এই বিকাশ প্রক্রিয়ার অর্থ, যোজনা ও সংগঠন যেমন প্রয়োজন সেই সঙ্গে আর একটি অত্যাবশ্যক জিনিস হল বিকাশ প্রশাসনে নিযুক্ত মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কেমন হওয়া উচিত তা বিস্তৃত বিশ্লেষণী দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন ডঃ দাশ।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আধিকারিক এবং প্রশিক্ষক উভয়ের মধ্যেই বিকাশ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের নিবেদিত মানসিকতা (commitment) থাকা উচিত। অন্যথায় বিকাশ প্রশাসন নিছক আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং বহু অর্থ ব্যয় করেও যথার্থ আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটানো যায় না। প্রশিক্ষণ ও 'নিবেদিত মানসিকতা' উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যে কত গভীর এবং প্রয়োজন তা তিনি কুমিল্লার সমবায় শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের আদর্শকে উদাহরণ হিসেবে ধরে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে উপ-জেলা স্তরে গ্রামীণ সমবায়ীদের প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তাতে 'নিবেদিত মানসিকতা' (commitment) না থাকায় বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সবচেয়ে নিম্নস্তর হল 'উপজেলা' যেখানকার বিকাশ প্রশাসনিক সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সেখানকার উপযোগী প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তুর ওপর। কিন্তু গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, উপজেলা স্তরে প্রশিক্ষণ-গ্রহণ-কারীদের মধ্যে গ্রামীণ সমবায়ের প্রয়োজনীয় "নিবেদিত মানসিকতা" নেই। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু প্রাণহীন, আচার-সর্বস্ব ও গতানুগতিক হওয়ায় গ্রামীণ সমবায়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত তাঁর এই বক্তব্য অন্যান্য বিকাশশীল দেশের গ্রামীণ বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন এই কাজের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব, উদ্দেশ্য ও উদ্দিষ্টের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। এটা একটি মানসিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপার। এই মানসিকতা যে অনুপাতে গভীর হবে সেই অনুপাতে সমবায় ও বিকাশ প্রক্রিয়ার সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। সরকারি প্রশাসনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যে রূপান্তরিত করার আন্তরিকতার মধ্যে। উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে এই আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশে কৃষক সমবায় সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ যদি যথাযথ প্রশিক্ষণ না পায় তাহলে বিকাশ প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক চরিত্র গ্রহণ করে। ডঃ দাশ বর্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিয়েছেন কী ভাবে বিকাশ-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। শুধু কেন্দ্রীয় স্তরে নয়, স্থানীয় উপজেলা স্তরেও প্রশিক্ষণের আন্তরিকতা ও ব্যাপ্তি অপরিহার্য। সমবায় ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ-গ্রহণকারীর নিবিড় যোগ থাকতে হবে, কাজ করার ইচ্ছে থাকতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা থাকতে হবে এবং তবেই প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে। আবার তাদের মানসিকতাকে প্রশিক্ষককে বুঝতে হবে। এইভাবে সরকারী প্রশাসন, সাধারণ গ্রামবাসী, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ-গ্রহণকারীর মধ্যে এক ধরনের জৈব সংযোগ (organic link) থাকা একান্তই প্রয়োজন। ডঃ দাশের গবেষণার মূল্য বক্তব্য এই। ১৯৬৭-এর দশকে কুমিল্লা সমবায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যা সফলভাবে করা গেছে তা ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে উপজেলা স্তরে করা গেল না বলেই সেখানকার গ্রামীণ বিকাশ পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে পারল না। গ্রামীণ বিকাশের কাজ এক ধরনের মিশনারি কাজ কুমিল্লায় সমবায় শিক্ষণের কাজ সফল হওয়ার মূলে ছিল গ্রামীণ বিকাশের জন্য "নিবেদিত মানসিকতা"র অধিকারী শ্রী আখতার হামিদ খান (ভূতপূর্ব আই. সি. এস.) ও তাঁর স্বার্থশূন্য সমবায়ী নেতৃত্ব। বাংলাদেশ গ্রামীণ বিকাশ বোর্ডের (BRDB) কার্যক্রমকে উপজেলাস্তরে সফল করতে হলে "কুমিল্লার আদর্শ"-কে সামনে রেখেই কাজ করতে হবে। আর্থিক সংস্থান ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অথচ জনবহুল দেশে গ্রামীণ বিকাশ ঘটাতে গেলে কৃষক ও গ্রামীণ সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে কার্যক্রমের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত "নিবেদিত মানসিকতা" গড়ে তোলা। তাহলেই মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে এবং আর্থিক অসাধুতা ও অপচয় বন্ধ হবে। তৃতীয় বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলির কাছে আলোচ্য গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা এখানেই।

ট্রেনিং অ্যাণ্ড কমিটমেণ্ট প্রোগ্রামস ফর ভিলেজ কো-অপারেটর্স ইন বাংলাদেশ—ক্ষণদামোহন দাশ / ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অব লোকাল গভর্নমেণ্ট, বাংলাদেশ / মূল্য (বাংলাদেশের মুদ্রায়) ৫০০ টাকা।

বাংলার লোককথা

নিবেদিতা চক্রবর্তী

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন একজন ক্ষেত্রগবেষক লোক-বিজ্ঞানী। তিনি সুদীর্ঘকালের বিপুল শ্রমধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে

দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় বর্তমান গ্রন্থ 'বাংলার লোক-কথা' প্রকাশ করেছেন।

'লোককথা' সবদেশেই অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়ে থাকে। কারণ কোনও জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে জানতে হলে লোকায়তিক জীবনধারা তাদের চর্যার বিচিত্র রূপকে তুলে ধরা দরকার।

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন ছাত্র জীবন থেকেই বাংলার নানা গ্রাম পরিক্রমায় অক্লান্ত উৎসাহী আর এই উৎসাহেরই টানেই গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিক্রমা করে দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। গ্রামের আমজনতাই তাঁর লোককথা সংগ্রহের প্রধান সহায়ক। তিনি অনুভব করেছেন, সাধারণ মানুষের মনের গহনে ভরা আছে কী অসাধারণ সম্ভার। ব্যক্তিগত বহু বাধা কষ্ট ও রুদ্ধতা উপেক্ষার ফসল এই 'লোককথা'—এ সত্য লেখক স্বীকার করেছেন। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি অবশ্যই মূল্যবান গবেষণা। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ধারা, তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য—সমগ্র ভারতের জীবনকে কীভাবে তরঙ্গিত করেছে—তার সামুপুঙ্খ অনুসন্ধান—এই গ্রন্থকে মূল্যবান করে তুলেছে।

প্রাচীন বাংলার নানা ভৌগোলিক বিবরণ ও বিস্তৃতির উল্লেখ আছে—যার মধ্যে দিয়ে বৃহৎ বাংলার বিচিত্র জনপদ মানবগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। নদীমাতৃক, কৃষিভিত্তিক বাংলার ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উন্মোচিত করে শ্রমসাধ্য কাজটি লেখক সানন্দে সুসম্পন্ন করেছেন এবং সমগ্র বাঙালির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। প্রাচীন সভ্যতার পত্তনকারী কোন জন-গোষ্ঠী একদা সমাজজীবনে ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এক সংস্কৃতির ধারা প্রবর্তন করেছিল। সংস্কৃতির এই ধারা লোকবাহিত হয়ে নানা ছড়ায় গানে, লোককথায় পাঁচালী ঝুমুর ছন্দে, হেঁয়ালী ধাঁধায়, কথা-উপকথায়, রূপকথার রূপকরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। আবার মন্দিরে মসজিদে চণ্ডীমণ্ডপে, দলিজে মাঠেঘাটে, লাঙলে-জোয়ালে, নৌকার বৈঠায়, কোদালের তালেতালে—নানাবৃত্তির দোলাচলে—প্রবাহিত ও বিশদ হয়েছে। এর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তিত ইতিহাস।

লেখক 'বাংলার লোককথা' গ্রন্থটির মুখপাত হিসাবে আটান্ন পাতার একটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত নিবন্ধ রচনা করেছেন। এখানে লেখক বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত, ধম্মপদ, বাইবেল, কোরাণ শরীফে'র-মত পবিত্র ও প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যেও উপদেশচ্ছলে নানা গল্পের সন্ধান করেছেন। এইগল্পগুলির মধ্যে ধর্মমত নির্বিশেষে এক চিরায়ত লোকায়তিক জীবনের কথা লেখক অনুসন্ধান করেছেন।

কাশ্মীরের রাজা দেবর্শর্মার সভাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা সম্ভবত দুর্বিনীত রাজপুত্রদের নীতিশিক্ষার জন্যে 'পঞ্চতন্ত্র' নামে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কথাসরিৎসাগর, বৃহৎ-কথামঞ্জরী, হিতোপদেশ, জাতকের কাহিনী প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও লেখক লোককথার আভাস পান। প্রাচীন এইসব কাহিনী কীভাবে পৃথিবীর বহুপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তারও নানা চমকপ্রদ উল্লেখ এই ভূমিকা অংশে আছে। কীভাবে নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনু-সন্ধানের মধ্যে দিয়ে লোককথার সন্ধান পেয়েছেন তার সরস বিবরণ দিয়েছেন।

ভারতীয় লোককথা কীভাবে বহু পর্যটকের মারফৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ লেখক এই গ্রন্থে দিয়েছেন। প্রাচীনকালে আর্যরা ইউরোপ ইরাণ ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। লেখক অনুমান করেন এই গোষ্ঠী বিভিন্নদেশে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের সাংস্কৃতিক বন্ধন ও আদান প্রদান ছিল, তার ফলে লোককথার গল্পাংশগুলো এভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একাধিক পারস্য সম্রাটের গ্রীস আক্রমণ, গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, সারা পৃথিবীব্যাপী জিপ্‌সীদের অবাধ আনাগোনা, আরবদের ভারতে বাণিজ্য করতে আসা ইত্যাদি বহুতর আদানপ্রদানের মাধ্যমে বহু-লোককথা বিদেশে গিয়েছে এবং বিদেশ থেকে ভারতে এসেছে—এ অনুমান স্বাভাবিক।

ভারতীয় গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' ইরাণ সম্রাট খ্রীন-শোরোয়াঁর (৫৩১-৫৭৯) আমলে কীভাবে ভারত থেকে ইরাণে এসেছিল তার এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন লেখক। এই গ্রন্থটি প্রথমে পাহলবী ভাষায় অনূদিত হয়, পরে এর থেকে প্রাচীন সিরিয় ভাষায় অনূদিত হয়। সিরিয় অনুবাদের পর এটি আরবিভাষায় অনূদিত হয়, আরবি থেকে তেরটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হল। ১২শ শতকে আরবি অনুবাদ থেকে পারসি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় লোককথা ইউরোপে

গিয়েছে আর ইউরোপীয় লোককথা ভারতে এসেছে। এই-ভাবে লোককথা বিশ্বসম্মেলন ঘটিয়েছে বলা যায়।

উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাস মালা' দিয়ে বাংলা মুদ্রণে লোককথা সংগ্রহের সূচনা। পরবর্তীকালে বহু গবেষক পণ্ডিত এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই ধারাকেই আরও বহুমুখী ও বিস্তৃত করার প্রয়াস নিয়েছেন। বর্তমান যুগের নানা ভ্রষ্টতার ভিতর লেখক আশ্চর্য ধৈর্যে ও নিষ্ঠায় গ্রামীণ জীবনের কাছাকাছি হয়েছেন। গ্রামীণ মানুষের চলমান জীবনছবি থেকে খুঁটে নিয়ে এসেছেন উপ-কথা-র রূপময়তা যা একই সঙ্গে জীবন সমাজ প্রকৃতিকে যেমন ছুঁয়ে যায়, মানুষের চিরকালীন গল্প বলার, শোনার আগ্রহ-কেও স্পর্শ করে আন্তরিক ভাবে।

'উপকথা' বলতে লেখক উপ+কথা—অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বা অসমাপ্ত বা অনিঃশেষ কাহিনীর কথা বলেছেন। 'উপকথায়' আছে সুন্দর সুন্দর প্রেমকাহিনী ও নীতিকথা। 'রূপকথা' অর্থে লেখক সুন্দর রূপময় যুবকযুবতী ও পরীর গল্প বলেছেন। এগুলো শিশুগল্প, বৈঠকী গল্প, পুরাণকথা, কেচ্ছা বা কিস্‌সা ইত্যাদি লোককথার উল্লেখ করেছেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির টানে অসংখ্য গ্রাম পর্যটন করে বহু গল্প সংগ্রহ ও গল্পগুলির কাঠামো ও চরিত্র অনুযায়ী কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছেন লেখক। সাধারণ প্রেমকাহিনী, ধাঁধামূলক, পশু-পক্ষী সরীসৃপ, প্রকৃতিমূলক ও শ্লোকমূলক। লোককথার বিচিত্র বিষয়ের পাশাপাশি অনিবার্যভাবে লোকজ্ঞান পরি-বেশনার ভঙ্গিটিও এসে পড়ে। অজয়নদের তীরবর্তী গ্রাম-বাসীদের গল্প বলার রীতিটি লেখকের কাছে অভিনব মনে হয়েছে। শ্রোতাদের দিকে মুখ করে বন্দনা গান করে গল্প বা কিস্‌সা আরম্ভ হত। 'আপাং দুলাল', 'শ্বেতবসন্ত', 'পেঁচো-চোর', 'সখীসোনা'—এই রীতির গল্প।

লোককথার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দেখা যায়, কথক শ্রোতার কাছে লোককথার আকারে পরিবেশন করেন—গল্পের পর গল্পের মালিকা গাঁথা উপহার। গল্পের চরিত্রগুলোও অনেক সময় নতুন গল্প ফাঁদেন—এ যেন Magic Box—একটি খাটের কথা, একশ তোতার গল্প এই শ্রেণীর।

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন গ্রামজীবনের মর্মমূল জেনে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। কৃষক জীবনের সুখদুঃখ তাঁর সংবেদনশীল মনে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগিয়েছে। শহুরে গবেষক দের মত তিনি গ্রামের মানুষকে ব্যবহার করেন নি। লেখক গবেষকদের গবেষণা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টি অর্জন করতে অনুরোধ রেখেছেন। গ্রামজীবনের মূল সুরকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তা বিশ্লেষণ করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তাতে প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে যা পরবর্তী প্রজন্মকে সাহায্য করবে দেশকে নিবিড়ভাবে চিনতে ও জানতে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি এটাই লেখকের বলিষ্ঠ আবেদন। এই বইএর অধিকাংশ কাহিনী বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ গ্রামের। মোট সাতাশটি লোককথা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এর মধ্যে ঐ দুটি জেলাছাড়া মেদিনীপুর, কোচবিহার, বীরভূম ও হুগলী জেলা থেকেও একটি করে কাহিনী এতে নেওয়া হয়েছে।

সাধারণত কৃষক পরিবারের মহিলা পুরুষ, কখনও গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। বহু কাহিনীর মধ্যে অন্য কাহিনীর সাদৃশ্য দেখা যায়, ঘটনা ও কাহিনীগত এই সাদৃশ্য সম্ভবত বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশনার সময় বহু মানুষের কল্পনার প্রক্ষেপে একই কাহিনী ভিন্নতা পেয়েছে। এই কাহিনীর শ্রোতা সাধারণ মানুষ তাই ধর্ম সমন্বয়ের স্বাভাবিক সুর এর প্রধান গুণ ও শক্তি। এবং এখানেই সম্ভবতঃ লোককথার শ্রেষ্ঠ মহিমা।

শেষ কথা বলা যায় এই বইটি সার্বিকভাবে গ্রামবাংলাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে অনেকটাই সাহায্য করবে। লেখকের এই আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ প্রশংসা ও সম্ভ্রম আদায় করে।

ভাষা ব্যবহারে ভূমিকা অংশে লেখক আর একটু সচেতন হলে ভাল হত। বইটি আর একটু দৃষ্টিশোভন হলে আকর্ষণীয় হত নিঃসন্দেহে।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বইটি অবশ্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে আশা করা যায়।

বাংলার লোককথা—মুহম্মদ আয়ুব হোসেন / পরি-বেশক পুস্তক বিপণি কলকাতা ৯ মূল্য ৩০ টাকা

উনিশ শতকের তিনজন বাঙালি মনীষীর জীবন ও কীর্তি

রণেন্দ্রনাথ দেব

আলোচ্য তিনখানি বই উনিশ শতকের তিনজন বাঙালি মনীষীর জীবন ও কীর্তি বিষয়ক আলোচনা।

মতিলাল শীলের নাম এখন আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। অথচ গত শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি। মতিলাল শীল সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। বল্লাল সেনের আমলে সুবর্ণবণিকদের শূদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়। এই সামাজিক মর্যাদাহরণ সত্ত্বেও সুবর্ণবণিকেরা যুগে যুগে দেশকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। গ্রন্থকার সুবর্ণবণিক সমাজের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করে মতিলাল-এর পিতা চৈতন্যচরণ শীলের জীবনকথা সূত্রাকারে বলেছেন। মতিলালের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন চৈতন্যচরণ মারা যান। বালক মতিলাল পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলেন। ইংরেজি বাংলা ও গণিত তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন; তাছাড়া ছিলেন সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে পারদর্শী। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল ফোর্ট ইউলিয়ম দুর্গে একজন সামান্য কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর খুল্লতাত ভগ্নী বিধবা হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়লে মতিলাল তাঁর বিষয় সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের কার্যভার গ্রহণ করেন। ভগ্নীর বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করতে করতে মতিলাল স্বাধীন ব্যবসা করার জন্য তাঁর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। "ব্যবসায়ে ছিল মতিলালের তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও ব্যুৎপত্তি। ১৮১৯ সালে একটি স্থানে কম দামে প্রচুর খালি শিশি বোতল বিক্রি হচ্ছে দেখে তিনি সমস্তগুলিই কিনে নেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে শিশি বোতলের ভীষণ চাহিদা বাড়লে মতিলাল তা বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেন। মিস্টার হাডসন নামক একজন বিহার আমদানীকারকই তাঁর খালি শিশি বোতলের অনেক অংশ কিনে নেন। এই শিশি বোতল কেনা বেচার মধ্য দিয়ে মতিলাল যা লাভ করেন ঋণের টাকা শোধ করেও তা তাঁর পরবর্তী ব্যবসার পুঁজি হিসেবে কাজ করে। কোন্ সময়ে বাজারে কোন্ জিনিসের চাহিদা বেশি হবে এ বিষয়ে তাঁর ছিল বহুদর্শিতা ও সুবিবেচিত বিচার শক্তি। আর এই বহুদর্শিতা, ভূয়োদর্শন ও সুবিবেচনা থাকার জন্য ব্যবসায়ে তিনি লাভ করেছিলেন এক অখণ্ড প্রতিপত্তি।" ১৮২০ সালে তিনি স্ট্রাণ্ড ফ্লাওয়ার মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্মিথসন সাহেবের মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এরপর থেকে দ্রুত উন্নতি শুরু হয়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাহাজের ব্যবসায়ে নামেন ও কালক্রমে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তি বলে গণ্য হন।

কিন্তু মতিলাল অমর হয়ে আছেন ধন আহরণের জন্য নয়, ধনের সদ্ব্যবহারের দরুন। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে মতিলাল দিয়েছিলেন এর জমি এবং নগদ বারোহাজার টাকা। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর প্রতিষ্ঠা করেন একটি দেবালয় ও অন্নসত্র। ১৮৪২ খ্রিঃ মতিলাল স্থাপন করেন "শীল্স্ কলেজ"। দু বছর পরে এটি রূপান্তরিত হয় একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে "মতিলাল শীল্স্ ফ্রি কলেজ"। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। বেহালায় একটি দেবালয় ও গঙ্গার স্নানের ঘাটও তিনি নির্মাণ করেন। সারাজীবনে তাঁর দানের অন্ত ছিল না।

মতিলাল ধর্মনেতা নন, সমাজ সংস্কারক নন, কিন্তু মানবপ্রেমিক। এমন মানুষের জীবনকথা প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। বইটি যদি সুসম্পাদিত হয়ে বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত হত আমরা পাঠকেরা আরও তৃপ্তিলাভ করতাম।

মতিলাল শীলের জীবনীর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী একটি সুন্দর কথা বলেছেন—"সমাজে যিনি ধনী মানী হন, তাঁরও সমাজবিবেক থাকা উচিত, যা আজকের বাঙালি চরিত্রে খুবই অনুপস্থিত। উনবিংশ শতককে রেনেসাঁস বলা যাবে কি যাবে না সে প্রশ্ন এখানে মুলতুবী থাক। সেদিনের কলকাতা গড়ে উঠেছিল বহু ব্যক্তি, যাঁদের সমাজবিবেক আছে, তাঁদের দানে ও ধ্যানে। মতিলাল শীল সকল সমাজেরই এক আদর্শ অগ্রণী পুরুষ।" দেখে খুশি হলাম যে মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন "এমন লোকের কর্মজীবন দেশের তরুণ প্রজন্মের জানা দরকার।" রাষ্ট্রের দ্বারাই শুধু জনহিতকর কাজ সম্পাদিত হবে না, ব্যক্তি মানবের চেষ্টা ও কর্মস্পৃহারও দাম আছে। তাঁর কীর্তিকেও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। একথা বিশেষভাবে মনে পড়ল নারায়ণ চৌধুরী প্রণীত বিদ্যাসাগর-চর্চা পড়ে। এখন ত বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাতের যুগ। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসকের "পদলেহী"! এমন লোকের জীবনকথা পাঠ করে আর লাভ কী? আজকাল মহাপুরুষ কেউ নেই, তথাকথিত মহাপুরুষদের বিচার প্রণালীও অত্যন্ত সহজ। যাঁরা বিপ্লবের সমর্থক (বিপ্লব কী বস্তু?) তাঁরাই মহামানব। অনায়াসে কে বিপ্লবী তা স্থির করা যায়। নারায়ণ চৌধুরী মাছিমারা কেরানির মত সেই ফর্মুলা অনুসরণ না করে বিদ্যাসাগরের কীর্তিকথা বিবৃত করেছেন। সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। কোনও নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপিত হয় নি। তবু বিদ্যাসাগরের

মহত্ত্ব সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম আমরা। প্রয়াত গ্রন্থকারের উদ্দেশে এজন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

নারায়ণ চৌধুরী শুধু যে নতুন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি তা নয়, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেসকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে সেগুলিকেও শিরোধার্য করে নিয়েছেন। আজকালকার গবেষকেরা এসব গাল গল্প বর্জন করার পক্ষপাতী (যেমন দামোদর সাঁতরের পার হওয়া)। কিন্তু বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও এসব গল্পের কি কোন দাম নেই? এক হিসাবে এদের মধ্যে দিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই কি ব্যক্ত হয় না? আমার মনে হয় নারায়ণ চৌধুরী কিংবদন্তীগুলির উল্লেখ করে উচিত কাজ করেছেন।

"বিদ্যাসাগরর্চ্চা" গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ থেকে এর আলোচনা পদ্ধতি অনেকটা বোঝা যাবে—জন্মকথা / পিতামহ ও পিতার পৃষ্ঠপট / শৈশব, বাল্যশিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার/ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার / বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার আন্দোলন / বাংলা গদ্যের উন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা / কার্মাটারে বিদ্যাসাগর / কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা / বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মূল্যায়ন / শেষ জীবন। পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া হয়েছে। সাবলীল গদ্যে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে লেখা বইটি পড়ে যেকোনও পাঠকই আনন্দ পাবেন।

মীর মশারফ হোসেন সম্বন্ধে ইদানীং অনেক বই লেখা হয়েছে। পারিজাত মজুমদারের বইটি সে তুলনায় ছোট এবং বৃহৎ কোনও পরিকল্পনা নিয়ে লিখিত হয় নি। কিন্তু বইটি মূল্যবান। তিনি অল্প পরিসরে মীরের জীবন কথা ও রচিত গ্রন্থাদি যেমন "রত্নবতী" "বসন্তকুমারী" নাটক, "গোরাই ব্রিজ" কাব্য, "জমীদার দর্পণ" নাটক, "বিষাদ সিন্ধু", "গো জীবন", "বেহুলা" গীতাভিনয়, "উদাসীন পথিকের মনের কথা", "গাজী মিয়াঁর বস্তানী", "মৌলুদ শরীফ", "বিবি খোদেজার বিবাহ", "হজরৎ ওমরের ধর্মজীবনলাভ", "মদিনার গৌরব", "এসলামের জয়", "হজরত ইউসুফ", "খোৎবা", "বাজীমাৎ", "আমার জীবনী", "বিবি কুলসুম", ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন। সর্বশেষ অংশে আছে মীরের লেখা বাউল গান। মীর ছিলেন কাঙাল হরিনাথের ভাবশিষ্য। কাঙাল হরিনাথ "ফিকিরবাদের ফকিরের দল" নামে একটি বাউল গানের দল খুলেছিলেন। জলধর সেন বলছেন, "আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরবাদের দলকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না।... তোমার বাড়িতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না"। মশারফ বলিলেন, "সে কি রকম কথা? তা কি হয়?" কাঙাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন "আমি ত গান করিতে জানি না।" কাঙাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জান না বটে কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মশারফ বলিলেন "তা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন।'

মীরের রচিত প্রথম বাউল গান:

রবে না দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে।

মীর "মশা বাউল" নাম গ্রহণ করে বাউল গান রচনা করেছেন। মীর মশারফর হোসেন বাংলা সাহিত্যে গদ্যস্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত, গীতিকার রূপে নয়, কিন্তু তাঁর অন্তর্জীবনকে জানতে হলে বাউল সঙ্গীতগুলিও পড়তে হবে। পারিজাত মজুমদার তেরোটি গান সংকলন করেছেন। একটি গান—

ভোলা মন! ঘোলায় পড়ে, সুপথ ছেড়ে
করলে একি কারখানা।
ঐ যে বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
তবু তোমার জ্ঞান হল না।
ঐ সকল চোরের কথায়, যাচ্ছ কোথায়
ফের ফের আর যেও না।

ওপথ দেখায় ভাল, ও মিছে আলো,
খানিক পরে আর রবে না।
শেষে ঘোর আঁধারে ঘুরে ঘুরে
পাবি রে মন ঘোর যতনা॥

ঐ ছয় চোরের ফেরে, এবার পড়ে

ঘরে কিছু রহিল না।
এখন খালি হাতে দেশে যেতে
ভয়ে মশার পা উঠে না॥
মীরের আরেকটি গান চমৎকার :
বৈটা গুরু ঝুটা পীর,
বালা হাতে নেড়ার ফকীর,
এরা আসল শয়তান, কাফের বেইমান,
তা কি তোমরা জান না॥
ভাল নয় ভাই বাড়াবাড়ি,
একদিন যেতে হবে যমের বাড়ি,
টাকা কড়ি, জোরের জারি, তথায় খাটবে না,
ক্ষুদ্র জীব মশার কথায় রাগ কর না॥

সামাজিক ইতিহাসের অগ্রদূত মতিলাল শীল—শ্যামল দাস / কালিদাস মল্লিক ২ নম্বর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ৬০এ কলুটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ / মূল্য উল্লেখ নেই

বিদ্যাসাগর চর্চা—নারায়ণ চৌধুরী / মুক্তধারা, প্রাপ্তিস্থান : পুঁথিপত্র, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ / মূল্য (বাংলাদেশ মুদ্রায়) ৭০ টাকা

মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান—পারিজাত মজুমদার / জাগরী, ৭৪/৫এ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৩ / মূল্য ২০ টাকা

জীবনানন্দের কবিতার ভবিষ্যৎ

বিজলি সরকার

আধুনিক বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জীবনানন্দ বলেছিলেন, খণ্ড কবিতায় নয়, অদূর ভবিষ্যতে নাট্য, শ্লেষ-সম্পৃক্ত দীর্ঘ কবিতা রচনার মধ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতা চূড়ান্ত সিদ্ধির স্তরে পৌছে এক নতুন কাব্যযুগ সৃষ্টি করবে। জীবনানন্দ এই অদূর ভবিষ্যতের সময়টা ধরেছিলেন পনের-কুড়ি বছর। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ পঞ্চাশেরও অধিক বছর। কিন্তু জীবনানন্দের কাঙ্ক্ষিত কাব্যযুগ আজও অনাগত। বাংলা দীর্ঘ কবিতায় চর্চা হয়ত কিছু হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দ স্বয়ং তাঁর শেষের দিকের কাব্য 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'য় দীর্ঘতর কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে প্রতীক সাঙ্কেতিকতা ত্যাগ করে একটা মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় তাঁর কবি চেতনাকে এক নতুন দিগন্তে উঠিয়ে এনেছিলেন। তাঁর সচেতন এই প্রচেষ্টার অনুসরণ করা পরবর্তী কাব্যযুগে ক্রমবর্ধমান সমস্যার চাপে হয়ত সম্ভব হয় নি। যুগ-মাহাত্ম্যের তারতম্যে এখনকার কাব্য-যুগও নিশ্চয় একটা নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার সংজ্ঞার আপেক্ষিকতাকে ধরে নিয়েও বলা যায় জীবনানন্দের বিস্তৃত আধুনিকতাবোধ এখনও আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর কবিতা শিল্পের অমরতায় প্রতিষ্ঠিত বলেই আজও তাঁর কবি স্বরূপের নবনব অন্বেষণে সমালোচকদের তৎপর করে তোলে। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে জীবনানন্দের ওপর দুটি বই এসেছে। ১. শীতল চৌধুরীর 'জীবনানন্দ অন্বেষণ' ২. সমীরণ মজুমদারের 'জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'।

প্রথম বইটি জীবনানন্দের কবিকৃতির ওপর মোট পনেরটি প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয়টি জীবনানন্দের গদ্য সাহিত্য মূল্যায়নের সঙ্গে অন্যান্য কবিদের সম্পর্কে আলোচনা। শীতল চৌধুরী তাঁর 'ইমপ্রেশনিস্ট কবি জীবনানন্দ' ও 'স্বররিয়ালিস্ট কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধ দুটিকে একটি সাধারণ সূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। বুদ্ধদেব বসুই প্রথম জীবনানন্দের কাব্যে আলোর ক্ষরণ কত বিচিত্রভাবে হয়েছে তার শিল্পমূল্যের প্রতি আমাদের সজাগ করেন। জীবনানন্দ তাঁর কবিতার নৈসর্গিক আলোর বিচিত্র রং-রূপ এবং সেই আলো সময়ান্তর ভেদে কতভাবে বদলে যায় তার নির্খুঁত ছবি এঁকেছেন। শীতলবাবু বলেন—"কেবল জীবনানন্দকেই ইমপ্রেশনিস্টদের যোগ্য উত্তরসূরী এবং পূর্ণমাত্রায় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র ইমপ্রেশনিস্ট কবি বলা যায়।" খুবই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। জীবনানন্দের ইমপ্রেশনিজম সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠীর ("আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়") সিদ্ধান্তের সঙ্গে শীতলবাবুর ঐকমত লক্ষ করা যায়। কিন্তু শীতলবাবু তাঁর বইএর সূত্রও সাজান দীপ্তি ত্রিপাঠীরই মত করে এবং তাঁদের ভাষার মিলও আশ্চর্য রকমের! যাই হোক বাকি চোদ্দটি

প্রবন্ধের মধ্যে 'বিশ্বযুদ্ধ ও সাতটি তারার তিমির', 'জীবনানন্দের কাব্যে নাট্যলক্ষণ', 'জীবনানন্দের নারী' ইত্যাদি প্রবন্ধ গুলির বিশ্লেষণ অভূতপূর্ব না হলেও উপভোগ্য।

জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ তেমন জনপ্রিয় নয়। এই কাব্যগ্রন্থ তেমন জনপ্রিয় হয় নি। এই কাব্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এবং পরের সময়ে সমাজের সর্বস্তরব্যাপী সংকটপূর্ণ জটিল পরিস্থিতির বিশ্বস্ত ছবি ছাড়াও তাঁর কবি মানসিকতার আরেক স্তর মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কবির মগ্ন চৈতন্যের নিগূঢ় উদ্ভাসন স্বররিয়ালিস্ট কবিতার উন্মেষ শুরু হয় এখান থেকেই। স্বররিয়ালিজম নিয়ে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ রেখেছেন বলে শীতলবাবু আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল জীবনানন্দের প্রখর কালচেতনার ওপর জোর দিয়েছেন। জীবনানন্দের কাব্যে নাট্যলক্ষণ নিবন্ধটিতে 'ননলতা সেন', 'বোধ', 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা-গুলির অসাধারণ নাট্যগুণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ বেশ স্বচ্ছন্দ। আবার এই তিনটি কবিতার সামগ্রিক কাব্যমূল্য নিয়ে আলাদা নিবন্ধ লিখেছেন। জীবনানন্দের কাব্যকৃতির ওপর একটা গঠনগত বিশ্লেষণ হিসেবে শীতল চৌধুরীর 'জীবনানন্দ অন্বেষণ' দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি জীবনানন্দ দৃষ্টিগত শুদ্ধতা ও মননের চাপে কীভাবে ক্রমাগত নিজেকে বদলেছেন! তাঁর সেই পরিণততর বোধির স্তরের নাগাল পেতে হলে আরো স্থির বিশ্লেষণের অবকাশও প্রয়োজন ছিল।

সমীরণ মজুমদারের 'জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' বইয়ে আছে দশটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি জীবনানন্দের গদ্য সাহিত্য নিয়ে। জীবনানন্দের জীবিতকালে তাঁর কোনো গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তিনি তাঁর প্রথম গল্প 'ছায়ানট' লেখেন ১৯৩২এ। 'ঝরাপালক' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তখন বেরিয়ে গেছে। এই একই সময়ে গল্প লিখেও কেন তা প্রকাশ করলেন না তার ব্যাখ্যা অনেকেই অনেকভাবে করেছেন। সমীরণবাবুর ব্যাখ্যা হল—"…তিনি আর দশজনের মত গল্প উপন্যাস লিখে সাধারণ একজন গল্পকার হিশেবে খ্যাতির স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছুর সৃষ্টি, যার হীরকদ্যুতির মাধ্যমে আবহমান বাংলা গল্প পাঠকের চিত্তে বিরাজ করতে পারেন। তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বাংলা গল্পের নতুন ডিক্‌সন, নতুন মাত্রা, নতুন ভাষা।" এটা ঠিকই যে তাঁর কবিতার মতোই এক বিশিষ্ট ভাষা রীতির জন্য জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস একটা আলাদা মাত্রা পায় তবু জীবনানন্দ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমাদর পান না। কবি জীবনানন্দেয় লেখা বলেই অনেকে কৌতূহলী হয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়েন। কথাসাহিত্যের উৎকর্ষের দিক থেকে জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস কতখানি সফল সে ব্যাপারে সংশয় থাকেই। কিন্তু সমীরণবাবুর কথাও মানতে ইচ্ছে করে যে, "বাস্তবে কবি জীবনানন্দ বোদ্ধা সাহিত্য রসিকদের কাছে কবি হিসেবে যেমন আদরণীয় ও গ্রহণীয় হয়েছেন ঠিক তেমনিভাবেই ক্রমে ক্রমে গল্পকার হিসেবেও উপযুক্ত সম্মান অর্জনে সক্ষম হবেন।"

সমীরণবাবুর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'কালের কবি এলিয়ট' প্রবন্ধটি এলিয়ট প্রতিভার বিকাশ থেকে পরিণতি পর্যন্ত আলোচনা রয়েছে। তিনি এলিয়টের কিছু কালজয়ী কবিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সাধারণ পাঠকের উপকার করেছেন। তাঁর বইএর আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'জনবাদী কবি চেরাবান্দারাজু'। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু সাহিত্যের কৃতী এই কবি সম্পর্কে আলোচনা বাঙালি পাঠকদের প্রয়োজন ছিল। একই ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়েও ভিন্ন প্রদেশের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটা অস্থিমজ্জাগত উদাসীনতার জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি আমাদের ঝোঁক কম। এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে সমীরণবাবু তাঁর বইএর শেষ প্রবন্ধটি "অনুবাদ : ঘর ও বাহির" লিখেছেন। এ বিষয়ে যত বেশি আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। আশা করি সমীরণ মজুমদারের বইটি পাঠকের সমাদর পাবে।

জীবনানন্দ অন্বেষা—শীতল চৌধুরী / সাহিত্যশ্রী / মূল্য ৩০ টাকা

জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—সমীরণ মজুমদার / অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ / মূল্য ২৫ টাকা।

উনবিংশ শতকের একজন নাস্তিক মুসলমান পণ্ডিত

শহিদুল ইসলাম

উনিশ শতক সমগ্র বিশ্বে সামন্ত অর্থনীতির পশ্চাদাপসরণ এবং পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতিষ্ঠার শতক হিসেবে চিহ্নিত। বৃটিশ কবলিত ভারতবর্ষেও সে ঢেউ লাগবে, তা স্বাভাবিক। লেগেওছিল। কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অভিঘাত ভারতবর্ষ তথা বাংলার দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজপতি জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর একাংশ বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও ইহজাগতিকতার চেতনায় উত্তেজিত এবং স্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামন্তবাদী অমানবিকতার বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ, তখন পার্শ্ববর্তী মুসলিম নেতৃবৃন্দ—তা থেকে সযত্নে সজ্ঞানে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুদের একটি শ্রেণী সমশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এগিয়ে যায়। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মের কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পূর্বের ঘটনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাঁরা ক্রমে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এ আগ্রহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শনের প্রতি মোহ থেকে সৃষ্ট নয়। ক্ষুদ্র ইহজাগতিক স্বার্থই এর পিছনে কাজ করেছিল। "ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা অনেক হিন্দুর তুলনায় অনেকটা অনগ্রসর। এর কারণ হল মুসলমানরা মনে করছে যে তাদের কাছে পূর্বযুগের যে জ্ঞান বিজ্ঞান রয়েছে, তা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এই অহমিকাই তাদের ইওরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আমাদের স্বজাতি ভাই মুসলমানের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা হল কেবল অর্থোপার্জনের এবং পার্থিব উন্নতির জন্য। তাই তারা মনুষ্যত্ব ও আত্মার বিকাশ সাধন বা জ্ঞান বিজ্ঞান হাসিলের জন্য ইংরেজি শিক্ষা করছে না।" (১ : ০০) ঢাকা মাদ্রাসার (১৮৭৪) প্রতিষ্ঠাতা তত্ত্বাবধায়ক উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান ইসলামী পণ্ডিত মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সুহ্‌রাওয়ার্দী ১৮৬৪ সালে বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব গোষ্ঠী এবং মুসলমানদের মধ্যে আবদুল লতিফ গোষ্ঠী এই ধারার অন্তর্গত। তবে হিন্দুদের মধ্যে রাধাকান্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একদল র‍্যাডিক্যাল ও সংস্কারবাদী মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন ইওরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে শক্ত হাতে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিপক্ষের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতনা থাকা মন্দ নয়, কিন্তু তা যে অনেক সময় একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা শুধু আজকের বাংলাদেশ বা উপ-মহাদেশের মুসলমানদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা বিবেচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সে কারণেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় ত নয়ই, ফারসি-আরবি-উর্দু ভাষায় উচ্চশিক্ষিত ও ঐতিহ্য-প্রপীড়িত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধি বৃত্তিক কোন আন্দোলনের কথা এযাবত জানা যায় নি। এর কারণ বোধহয় এই যে ঐ সময় মুসলিম পণ্ডিতবর্গ, রক্ষণশীলই হন আর প্রগতিবাদীই হন, আমাদের বোধগম্য কোন ভাষায় তাঁরা জ্ঞানচর্চা করেন নি। তাই বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-ভাষী বাঙালিদের কাছে তাঁরা অপরিচিতই রয়ে গেছেন। অতি সম্প্রতি, গবেষণার ফলে সেই সময়ের একজন ব্যতিক্রমী মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তিনি হলেন আবদুর রহীম দাহ্‌রী (১৭৮৫-১৮৫৬)। 'দাহ্‌রী' শব্দটির অর্থ নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদী বা বস্তুবাদী। উনিশ শতকের সূচনা-

লগ্নে পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে তাঁর মত একজন আধুনিক চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়কর।

১৭৮৫ সালে অযোধ্যার গোরখপুরে আবদুর রহীমের জন্ম। পিতা মোসাহেব আলী ছিলেন একজন তাঁতী। ফারসি ভাষার প্রতি পিতার ছিল গভীর আগ্রহ। ছোট-বেলায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে দাহ্‌রীর বাঁ হাত অকেজো হয়ে যায়। ফলে পৈত্রিক পেশার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে তিনি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি একাধারে ঐতিহ্য-বাহী ইসলামী শিক্ষা, ফারসি, আরবি, তুর্কি, পুস্তু, ইংরেজি, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ১৫ বছরে ফারসি শিক্ষা শেষ করে তিনি আরবি শেখেন। তারপর গোরখপুর থেকে ৪৮০ মাইল দূরে টাণ্ডায় পিতার মুর্শিদের কাছে অতি কষ্টে তিন বছর জ্ঞানার্জনের পর ১৮০৪ সালে উচ্চশিক্ষার্থে লখনৌ গমন করেন এবং এক বছর সেখানে অবস্থান কালে তিনি ফারসি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'তামান্না' (অভিলাষ)। শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর লখনৌতেই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ভাবান্তরের সূত্রপাত হয় বলেই মনে হয়। শিয়া ও সুন্নি মুসলমানের মধ্যে প্রায়শই দাঙ্গাহাঙ্গামা তাঁর মনকে বিষিয়ে তোলে।

অতঃপর তিনি দিল্লি যান। ১৮০৫-১৮০৮ এই তিন বছর তিনি সেখানে শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত থাকেন। ভারতীয় ওহাবী আন্দোলনের মহাগুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মগুরু মহম্মদ আবদুল আজিজের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা অপর পুত্র মোল্লা রফিউদ্দীনের কাছে অঙ্কশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয় এবং হাকীম শরীফ যাঁর কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা, করেন। এখানে সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা সৈয়দ আহমেদ রায়বেরিলি। ১৮০৮ সালে তিনি এলফিনস্টোন ও ফ্রেজারের সঙ্গে আফগানিস্তান যান এবং এক বছর (১ : ৫) মতান্তরে ৪ মাস (২:৭৭৫) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন। তিনি পুনরায় দিল্লিতে ফিরে আসেন। দিল্লির সমাজে বসবাস, বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ পাঠ এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংস্পর্শ তাঁকে ক্রমশঃ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। ফ্রেজারের অনুমতিক্রমে (২ : ৭৭৫) তিনি ২৫ বৎসর বয়সে ১৮১০ সালে কলকাতায় আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বৎসর কাল সেখানেই অতিবাহিত করেন। ফ্রেজারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি কি ফ্রেজারের অধীনে চাকরি করতেন? হতে পারে তিনি ফ্রেজারকে ফারসি শেখাতেন এবং দোভাষী হিসেবে তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন।

কলকাতা তখন কেবল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীই নয়; সারা ভারতের নতুন সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখানকার গণতান্ত্রিক ও মুক্ত পরিবেশ, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন-সাহিত্য চর্চা এবং চিন্তা ও কথা বলার স্বাধীনতা তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। দিল্লির ও লখনৌর সামন্তবাদী, ঐতিহ্য পীড়িত ও রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে তিনি কলকাতার প্রাগ্রসর সংস্কৃতির তুলনা করতে সক্ষম হন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাতে কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল, সে বিষয়টি তিনি সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতার খোলামেলা নতুন সমাজে বসে তিনি খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি ও ইহুদী ধর্মের শাস্ত্রমতগুলি অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। এতে তাঁর ধর্মীয় উদারতাবাদে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে 'নাস্তিক' বলে পরিচয় দিতে থাকেন (৪ : ১২৯)। তবে মওলানা আবুল কালাম আজাদের মন্তব্যে জানা যায় যে তাঁর মতা-মতের জন্য তখনকার আলেম সম্প্রদায় তাঁর উপর খুশি ছিলেন না এবং তারাই তাঁকে তাচ্ছিলের সঙ্গে 'দাহ্‌রী' বলে সম্বোধন করতেন (৭)। মওলানা আজাদের মতকেই মহম্মদ শামীম খান সমর্থন করেন (১০)। তিনি ছিলেন প্রকৃতি-বাদী। প্রাণিহত্যা, তাদের কষ্ট দেওয়া, গাছের ফুল-ফল বা পাতা ছেঁড়াকে তিনি অবৈধ বলে মনে করতেন। গাছ-পালারও যে অনুভূতি আছে তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রায়ই শিকারিদের কাছ থেকে পাখি কিনে উড়িয়ে দিতেন।

কলকাতায় তিনি বিখ্যাত ফারসি পণ্ডিত ডঃ মার্টিনের কাছে ইংরেজি শিখতে শুরু করেন (২: ৭৭৬) এবং অল্প-কালের মধ্যেই ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। Committee of Public Instruction এর তৎকালীন সম্পাদক ও কলকাতা মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক লুমসডেন (১ : ১২৮) তাঁকে ইংরেজি বইএর ফারসি ও আরবি ভাষায় অনুবাদের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি জ্যামিতি, গণিত ও বীজগণিতের বই ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তথ্যের অপ্রতুলতা দাহ্‌রী সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেমন তাঁর ইংরেজি শেখা ও জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরই কৃতী ছাত্র ও রামমোহন রায় রচিত "তুহফাতুল

মুওয়াহ্‌হীদীন" গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক উবায়দুল্লাহ্‌ উবায়দী তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন "কোন শিক্ষক ছাড়াই তিনি স্বয়ং গ্রন্থ পাঠ করে ভাল ইংরেজি শিখলেন। তিনি ইংরেজি বলতে সক্ষম ছিলেন না।" (১ : ১২৮)। অথচ মুজিব আশরাফ জানিয়েছেন "In English he acquired such a mastery that by the end of his career he held the post of English teacher in Fort William College" (2 : 998)। মুজিব তাঁর প্রবন্ধের তথ্যের জন্য মূলতঃ সূত্র (৮) ও (৯)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

আবদুর রহীম দাহ্‌রী আদৌ কি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? টমাস রোবাক (১৮১৮) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরবি-ফারসি ও উর্দু বিভাগে কর্মরত যে ৩৩ জন মৌলবী মুন্‌শির নাম জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আরবি ফারসি বিভাগে জনৈক আবদুর রহিমের নাম পাওয়া যায় (৫:৩৫)। তিনিই কি দাহ্‌রী? কিন্তু ডঃ এম কে এ সিদ্দিকী (১৯৭৪) উক্ত কলেজের যে ২২ জন মুনশির নাম করেছেন, সেখানে আবদুর রহিম নামে কারও সন্ধান মেলে না (৫:৩৪)! বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আরও ঘনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। দাহ্‌রী যদি সত্যিই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করে থাকেন, তাহলে আরবি ফারসি বিভাগে কাজ করাই স্বাভাবিক। কারণ উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠার মূল কারণই ছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশী ভাষা শেখানো। দেশীয়দের ইংরেজি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা কি সেখানে ছিল? থাকলেও, ইংরেজি শেখানোর মত যোগ্যতা অর্জন করা কি সেই সুদূর অতীতে কোন ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল?

কলকাতায় তিনি কয়েক বছর টিপু সুলতানের পুত্র সুলতান মুহম্মদ শুকুরুল্লাহ্‌র তিন পুত্রের গৃহ-শিক্ষক হিসেবে তাঁদের টালিগঞ্জস্থ বাড়িতে বাস করে ছিলেন। কলকাতার আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন এবং সাহিত্য-রাজনীতির সংস্পর্শে তাঁর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়। তাঁর মনে বহু নতুন নতুন প্রশ্ন উদিত হয়। জীবনের সারবস্তু কী, দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কী এসব প্রশ্ন তাঁর মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন ধর্মের সত্যাসত্য নিয়েও তাঁর মন আন্দোলিত হয়। তিনি একজন অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিকে পরিণত হন। দাহ্‌রীর চিন্তা সম্পর্কে তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে জানা যায় "তাঁর চিন্তা ছিল স্বাধীন ও 'তকলীদ'এর (শাস্ত্রজ্ঞ আলেমদের ব্যাখ্যা ও তাঁদের নির্দেশিত শরীয়তী আইনের সূত্রগুলির অনুসরণ) উর্ধ্বে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবেত্তা ও ইমামদের মধ্যে নানা মতবিরোধ লক্ষ করে তিনি শেষ পর্যন্ত ধর্মের প্রতি, এমন কি আল্লাহ্‌র প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন।" (৬:৪৬)। উবায়দীর মতে দাহ্‌রীর ধর্মবিশ্বাসের সার কথা হল "ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো ধর্মনেতাদেরই সৃষ্টি।" (১:১২৮) উবায়দীর আত্মজীবনী পাঠে আরো জানা যায় যে 'শরহি হিকমাতুল ইশরাক' গ্রন্থ পাঠ করে তিনি 'ইশরাকিয়া' মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। (১:১২৭) ইশরাকী দার্শনিকগণ ওহীর অনুসারী নন (১৮৭)। সে যুগে প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ্‌ আবদুল আজিজের (১৭৪৬-১৮২৩) কাছে প্রথম জীবনে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এমন একজন ব্যক্তির আধুনিক যুক্তিবাদীতে রূপান্তর সত্যিই অসাধারণ ঘটনা। জানা যায় যে তাঁর এককালের সহপাঠী সৈয়দ আহমেদ রায়বেরিলি ও মওলানা ইসমাইল ১৮২০ সালে কলকাতায় এসে পুরনো বন্ধু আবদুর রহীমকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা করেন নি (৪ : ১২৯ ও ২ : ৭৭৭)।

তাঁর মৃত্যুর দিনক্ষণ নিয়েও বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। মুজিব আশরাফের প্রবন্ধে তাঁর মৃত্যুর বছর দেখানো হয়েছে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু মালাহুদ্দীন আহমেদের প্রবন্ধে দেখা যায় যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২৯ ডিসেম্বর ১৮৫৩। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ উবায়দীর আত্মজীবনী অনুযায়ী মনে করেন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬। এখানেও গবেষণা প্রয়োজন।

আবদুর রহীম দাহ্‌রী রামমোহনের চার বছর আগে কলকাতায় আসেন। আরবি ফারসি ভাষার এই দুই পণ্ডিতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগাযোগের সংবাদ জানা না গেলেও বলা যায় যে তিনি শুধু রামমোহনের সমসাময়িকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রামমোহনের মুসলিম সহযাত্রী (২ : ৭৭৬)। দাহ্‌রীও মনে করতেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে, সেই নতুন জ্ঞান চর্চাই উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি (২ : ৭৭৬)। তিনিও রাজা রামমোহন রায়ের মত কলকাতায় বসে একই মতবাদ প্রচার করতেন (২ : ৭৭৭)। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পক্ষে পুস্তক রচনা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়। ইংরেজি ভাষা থেকে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানেরও নীতি শাস্ত্রের অনেক রচনা তিনি ফারসি ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মালিহাবাদীর বই (৯) থেকে মুজিব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্য সরবরাহ করেছেন, তা হল দাহ্‌রীও রামমোহনের মত লর্ড হেস্টিংসকে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন (২ : ৭৭৭)। কারণ তিনি মনে করতেন কেবল অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের প্রসার সম্ভব নয়।

দাহ্‌রী বাঙালি ছিলেন না। অনেক ভাষাবিদ ছিলেন। কিন্তু বাংলা জানতেন কিনা, জানা যায় না। তবে না জানারই কথা। কারণ সেকালে অভিজাত শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী বাংলা ভাষাকে স্বনজরে দেখতেন না। তিনি যে বাংলায় কিছু লেখেন নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গেলে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করতেন কিনা জানা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তিনি ১৮১৩-১৮১৪ সালে ঢাকায় এসে এক বছর কাটিয়ে যান। সেই সময় তিনি বেশ কিছু আরবি ও ফারসি কবিতা রচনা করেন। ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর পরিসরে কোন দেশের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল মাতৃভাষা। বাংলার বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষায় তাঁর দখল না থাকায় এদেশের জনগণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্মেষের প্রাক্কালে চিন্তা চেতনায় রামমোহনের সমসাময়িক ও সহযাত্রী আবদুর রহীম দাহ্‌রী স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রামমোহনের মত কোন আলোড়ন তুলতে পারেন নি।

ভাষাগত কারণে কলকাতার ক্ষুদ্র পরিসরেও তাঁর অগ্রবর্তী চিন্তা স্ব-সম্প্রদায়ের বাঙালিদের অন্তর স্পর্শ করতে পারেনি। অন্যদিকে, যাঁদের সঙ্গে তাঁর ভাষাগত আদানপ্রদান চলত, সেই উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব তাঁর মত একজন নাস্তিকের প্রতি কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিই। উবায়দুল্লাহ্‌ আত্মকথায় লিখছেন "বিজ্ঞানের আরবি গ্রন্থ সমূহে পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, ইওরোপীয় বিজ্ঞান গ্রন্থে যখন তার পরিপন্থী তত্ত্ব দেখতে পেলাম, তখন মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো।" (১ : ১২৭) তখন তিনি কলকাতায় অবস্থানরত ভারতবর্ষের অন্যতম জ্ঞানী এবং অঙ্ক, পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ দাহ্‌রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্‌র মত সেকালের একজন মুক্তমনা ও আধুনিকতায় বিশ্বাসী মানুষের মনেও দাহ্‌রীর শিষ্যত্ব গ্রহণে ধর্মীয় সংস্কার বাধার সৃষ্টি করে। শেষে ইসলামের ইতিহাস ঘেঁটে যে সব মুসলিম পণ্ডিত ও নেতা বিধর্মীর কাছে জ্ঞানচর্চা করতে কুণ্ঠিত হননি, সেইসব উদাহরণ সামনে এনে মনে শক্তি সঞ্চয় করেন এবং দাহ্‌রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (১ : ৭৮-৭৯)। এককথায় বলা যায় যে ভাষার প্রতিবন্ধকতায় একদিকে যেমন তিনি বাংলার বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ে আসীন হতে পারেন নি, অন্যদিকে আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কারণে স্ব-শ্রেণী ও স্ব-ভাষী গোঁড়া ও রক্ষণশীল আলেম সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিতান্তই একা—নিঃসঙ্গ। স্মরণযোগ্য যে চিরকুমার দাহ্‌রী প্রতি গঞ্জে টিপুর পৌত্রদের গৃহশিক্ষকতা ছেড়ে তালজলা নামক খোলা মাঠে একটি তাঁবুর মধ্যে পরবর্তী জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়ে দেন (৩ : ৩৪৫ এবং ১ : ৫)। কিন্তু কেন? সামাজিক প্রত্যাখ্যান নাকি সমাজের প্রতি তাঁর অভিমান?

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজে আবদুর রহীম দাহ্‌রীর মত একজন মানুষের আবির্ভাব বিস্ময়কর মনে হলেও, আঠার শতকের ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় ও নৈরাজ্যে এবং সেখান থেকে মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য ওহাবী আন্দোলনের মন্ত্রগুরু শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌র শিক্ষা মুসলিম সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধির মুক্তির যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, সে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে তা অস্বাভাবিক মনে হবে না (৪)। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র (১৭০৩-১৭৬২) চিন্তার দু/একটি নজির তুলে ধরলে বোঝা যাবে যে এধারায় বিশ্বাসী কারও যুক্তিবাদী হওয়া অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিক। তাঁর বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা' গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলছেন "ইসলামের নীতি ও বিধানগুলিকে যুক্তি ও বিশ্বাসের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ বলে মানুষ তা পালন করবে সে যুগ আর নেই।" (৪ : ১২১)। জানি, আজও এ সত্যের মুখোমুখি হতে উপমহাদেশের ধর্মান্ধ আলেমবৃন্দ স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। ওয়ালিউল্লাহ্‌ বুঝেছিলেন শিয়া-সুন্নী, শাফেয়ী ও সুফী; আরাবি ও সরহিন্দি ইত্যাদি নানাভাবে বিভক্ত এবং দ্বন্দ্বরত মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের একমাত্র পথ হল মুক্ত

বুদ্ধির চর্চা এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির আদর্শ। তাই তিনি ঘোষণা করেন "ধর্মের নীতি ও আইন কখনই এত সংকীর্ণ হতে পারে না যে সে মত বা আচরণের ঈষৎ পার্থক্যে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়।" (৪ : ১২৫-১২৬)। আরও বলেন "কোন একটি মতকে ধ্রুব সত্য জেনে আঁকড়ে বসে থাকা এবং এর বিপরীত মতের অস্তিত্বই অস্বীকার করা কোন কাজের কথা নয়, কারণ ইজতেহাদের (সত্যানুসন্ধিৎসা) মূল নীতিই হল সব মতামতের মধ্য থেকে সত্য পথ বেছে নেওয়া ও সেই সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করার প্রস্তুতি।" (৪ : ১২৫-১২৬)।

উত্তর ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পূর্বে মুসলমানের উচ্চশিক্ষা ও শাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল ওয়ালিউল্লাহর পুত্রদের দ্বারা পরিচালিত দিল্লির মাদ্রাসাটি (৪ : ১৯২)। ১৭৬২ সালে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ মাদ্রাসার কার্যভার গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেই শুধু নয়, ভারতের বাইরে থেকেও ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষার্থে এই মাদ্রাসায় পড়তে আসত। আবদুল আজিজ পিতার আদর্শেই মানুষ হয়েছিলেন এবং পিতার "চিন্তাধারা বিকশিত ও প্রচারিত হয়েছিল প্রধানতঃ পুত্র শাহ আবদুল আজিজের মাধ্যমে।" (১১ : ২২)। পিতার রচিত প্রায় ৪০টি গ্রন্থ গুরুত্ব সহকারে সেখানে পড়ানো হত। তাই "যিনি পণ্ডিত—ইজতেহাদের ক্ষমতা যাঁর আছে—আর সে ক্ষমতার একটি যুক্তি সম্মত মাপকাঠিও যিনি তৈরি করেছেন—তাঁর পক্ষে 'তকলীদ' অবশ্য কর্তব্য নয়" (৪ : ১২৬) পিতার এই শিক্ষা পুত্রের মাধ্যমে ছাত্র আবদুর রহীম দাহ্‌লীর মনকে প্রভাবিত করবে, তাতে আশ্চর্য কি! তবে একই ওস্তাদের শিষ্য সৈয়দ আহমেদ রায়বেরিলি 'পণ্ডিত্যে খাটো' (৪ : ১৩১) হলেও উগ্রতা, ধর্মোন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতায় দাহ্‌লীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাই দাহ্‌লীর যুক্তিবাদী আধুনিক মন তাঁকে সমর্থন জানাতে পারে নি। হবিবুল্লাহ মনে করেন পরবর্তী ওহাবীদের উগ্র ধর্মোন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতা মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা প্রসারের একটি সুন্দর সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। যেমন নষ্ট হয়েছিল নবম শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী আরবের 'মুতাজিলা' আন্দোলন। মুসলমান সমাজে সুস্থ মানবতাবাদী, ইহ-জাগতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা প্রসূত আন্দোলনগুলি এভাবেই বার বার সমকালীন অগ্রসরমান জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মান্ধ আলেম সম্প্রদায়ের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সব যুগেই আবদুর রহীম দাহ্‌লীর মত দু-একজন নিঃসঙ্গ, প্রতিবাদী তথা যুক্তিবাদী এবং ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন। এঁরাই মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।

আবদুর রহীম দাহ্‌লীর রচনাবলী :—

১. ফারহাংগী দাবিস্তান—একটি ফারসি ব্যাকরণ,

২. পান্দনামা-ই-বাহ্‌রামী—নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত একটি ফারসি পুস্তক। টিপু সুলতানের পৌত্র যুবরাজ বাহ্‌রামের শিক্ষার্থে রচনা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে কলকাতায় প্রকাশিত।

৩. তারীখ-ই-হিন্দুস্তান—জে, সি, মার্শম্যানের 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' ফারসি-ভাষান্তর।

৪. কারনামা-ই-হায়দরী—হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের জীবন ও অবদান ভিত্তিক একটি ইতিহাস গ্রন্থ। ইংরেজি থেকে অনুবাদ। কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত।

৫. এ্যাসপ্‌স্ ফ্যাবল—১৮৩০ সালে প্রকাশিত ঈশপের গল্পের ফারসি ভাষান্তর।

৬. মার্‌রিকুল আনওয়ার—জন্ গ্রে'র উপকথার ফারসি ভাষ্য।

৭. হিকাকাত-ই-তাবরাত আয়াত—ইংরেজি থেকে লোকমান হাকীমের গল্পের ফারসি অনুবাদ। ১৮৩০এ এডুকেশন প্রেস বইটি প্রকাশ করে।

৮. ফাতিহাতুত্ তরজামাহ্—এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে হাটনের অঙ্ক ও বীজগণিতের কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ (১৮৩৬)। বইটির পুরো নাম 'তারাজিম-এ-রাসায়েল-এ-হিকামিয়াহ্।'

৯. শিগরাফ-বাহান-ইবরাত তাওয়ান — "মানুষের স্বভাব, মানব সমাজ সৃষ্টির ধারা, আদর্শ স্থানীয় সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী, মানব সমাজে শরিয়তের উদ্ভব, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধ্যানধারণার উৎপত্তি, আত্মার উৎকর্ষ ও অবনতি, ধর্ম সম্পর্কে মুসলিম হুকামার ধ্যান-ধারণার অসারতা, স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কৃত্রিম ধারণা" (৬:৪৬) ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত এবং "তাঁর নিজের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী, তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশ, একজন সংস্কারবদ্ধ গোঁড়া মুসলমান থেকে তাঁর নাস্তিক্যে উপনীত হওয়া" (৩:৩৪৭) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ৩৮ বৎসর বয়সে লেখা তাঁর

আত্মজীবনী 'আফসানা-এ-দেরীন-এ-রোযগার-নামাহ্‌নিগার' পুস্তিকাটি এই গ্রন্থের শেষাংশে জুড়ে দেওয়া আছে। বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজও অপ্রকাশিত। একটি কপি পাণ্ডুলিপি ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, জানিয়েছেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (৬:৪৬)।

১০. আন্‌ওয়ারুল মাশরিকিয়াহ্-ফী-আসরারিল মান-তিকিয়াহ্' সংক্ষেপে 'আল আন্‌ওয়ারুল মাশরিকিয়াহ্'—যুক্তিবিদ্যার বই। জ্ঞানের উৎসমূল ও মানুষের বাকশক্তির উৎপত্তি সম্পর্কে বিশদ ও পণ্ডিতোচিত আলোচনা। (১.১২৯)।

১১. হেকীম ফ্যাবল।

১২. জাবর-ওয়া-মুকাবালাহ্—ব্রাইজের (Bridge) বীজগণিতের আরবি অনুবাদ।

১৩. রিসালা-ই-ইলম-ই-হাইয়াত।

১৪. মুনাযারা-ই-আরবি ওয়া ফারসি।

১৫. যারী-শাকিল—আধুনিক বলবিদ্যার নিয়ম ও তত্ত্ব সম্পর্কিত পুস্তিকা (২:৭৭৬)।

১৬. সাভলাত-ই-জায়গাম—টিপু সুলতানের বীরত্ব ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর গৌরবপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী।

১৭. মুনাযারা-ই-চশম-ও-গোশ্—তর্কশাস্ত্রীয় পুস্তক।

তথ্য নির্দেশ :

১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ "মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহ্‌রাওয়ার্দী" ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৪।

২. Mujeeb Ashraf "Note on Abdul Rahim Dahri : A Forward Looking Muslim Scholar of the Early 19th Century" Proceedings of the Fourtieth Session of the Indian Historical Congress, Andhra Pradesh University, Waltair, 1979 p. p. 774-778.

৩. A. F. Salahuddin Ahmed. "Muslim Rationalist Thought in the Nineteenth Century Bengal : Abdur Rahim Dahri (1785-1853) মহোম্মদ মনিরুজ্জামান ও মাহ্‌মুদ শাহ্ কোরেশী সম্পাদিত সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থে মুদ্রিত ২৬ মার্চ ১৯৮৫। পৃষ্ঠা ৩৪২-৩৪৮।

৪. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ: 'ভারতে ওহাবী আন্দোলন' —'সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত, বাংলা একাডেমি ঢাকা এপ্রিল ১৯৭৪ পৃষ্ঠা ১১৭-১৩৭।

৫. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ : 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা—প্রথম খণ্ড' বাংলা একাডেমি ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮৩।

৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : 'বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য (উনবিংশ শতাব্দী)' 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৮৩।

৭. 'Naksey Azad'—The book in which the statement of Maulana Abul Kalam Azad about Abdur Rahim Dahri has been compiled by Maulana Golam Rasul Nehr of Lahore. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষার অধ্যাপক কলিম সাসারামীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে সংগৃহীত।

৮. Abdur Rahman Parwaiz "Abdur Rahim Dahri Ki Khud Nawisht Swanih Umri" 'Jamia' April 1975, Quoted by Mujeeb Ashraf op. cit.

৯. Maulana Abdul Razaq Malihabadi "Azad Ki Kahani Khud Azad Ki Zubani' Hali Publishing House, Delhi 1958. Quoted by Mujeeb Ashraf op. cit.

১০. মোহাম্মদ শামীম খাঁন : 'মওলানা উবায়দী ঔর উনকি উর্দু শায়রী' (উর্দু) 'কওমী জবান' মার্চ ১৯৮৭, আঞ্জুমানে তাবাক্কী উর্দু, করাচি পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ২৩-২৭।

১১. আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)' লেখক সংঘ প্রকাশনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ১৯৬৪।

রসশাস্ত্রের আলোকে শেক্সপীয়রের ওথেলো

রাত্রি রায়

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনেকগুলি বিভাগের মধ্যে রসবাদ অন্যতম। ধ্বনিবাদ, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি অনেক বিচার-ধারার মতই রসবাদের উৎস ভরতমুনির "নাট্যশাস্ত্রে" নিহিত। পরবর্তী আচার্যদের টীকা ও আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এই রসশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। স্থানকাল নির্বিশেষে সব সাহিত্যকীর্তির প্রতিই রসবাদকে প্রয়োগ করা যায়। এইজন্যই শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। আলোচনা শুরু করার আগে রসশাস্ত্র বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

রসশাস্ত্রানুসারে রসানুভূতিকে আনন্দময় বলে স্বীকার করে নিলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়: করুণরসের আস্বাদন কেমন করে আনন্দময় হবে? এই প্রশ্নটি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা ট্র্যাজেডির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এই বিষয়টিকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। যা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—

(১) কাব্যের সৃষ্টি কোন নিয়মের অধীন নয়, তাই এই সৃষ্টির জগতে অনবরত আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে। কার্য-কারণের নিয়মানুসারে দুঃখের কারণ দুঃখই, কিন্তু কবির সম্মোহনী স্পর্শে দুঃখও আনন্দে পরিণত হয়। আশ্চর্য জগন্নাথ তাঁর "রসগঙ্গাধর" ও বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্য-দর্পণে" এই মত পোষণ করেছেন:

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।[১]

(২) লোল্লটাচার্যের মতের খণ্ডন করে ভট্টনায়ক বলেছেন করুণরসের অনুভূতি দুঃখদায়ক নয়। তাঁর মতে সহৃদয় পাঠক কবিতার অর্থ বোঝার পর কাব্যকলার সৌন্দর্যের প্রতি সজাগ হন। এর দুটি ফল হয়: (ক) দর্শক বা পাঠক ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে মুক্ত হন, আর (খ) বিভাব ইত্যাদিরও সাধারণীকরণ হয়। অতএব পাঠক সানন্দে কাব্যের রসগ্রহণ করতে পারেন ও করুণরস থেকেও আনন্দ গ্রহণে সমর্থ হন।

(৩) কোন কোন পণ্ডিতের মতে রস উৎপন্ন হয় না, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অনুভূতিগোচরও হয় না। রসগ্রহণ করার অর্থ—শব্দ, সঙ্গীত বা অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান মূলতঃ আনন্দজনক। অভিনব গুপ্ত বলেছেন এই আনন্দময় উপলব্ধিই রসের অনুভূতি এবং এখানে আনন্দই প্রধান, দুঃখের প্রবেশ নেই।

করুণরসের উপলব্ধি বিষয়ে এ ছাড়াও কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে এত গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শেক্সপীয়রের নাটকের প্রতি রসবাদের প্রয়োগ কতদূর সম্ভব এবারে সেটাই বিচার্য।

"ওথেলো" নাটকটিকে নেওয়া হয়েছে কেননা এই নাটকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আলোচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। নবরসের সব তালিকাতেই শৃঙ্গার রসকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে, আর এই শৃঙ্গার রসই "ওথেলো"র অঙ্গীরস। নাটকের পক্ষে শৃঙ্গার ও বীররসের ব্যবহারই প্রশস্ত।[২] "ওথেলো"-তে দুইয়েরই ব্যবহার আছে।

আলোচনা শুরু করার আগে একটি বাধা অতিক্রম করতে হবে। সংস্কৃত সাহিত্য বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি খুব একটা সহানুভূতিশীল নয়, তাই এখানে ট্র্যাজেডির অভাব। এটা ঠিকই যে ভবভূতি বলেছেন একো রসঃ করুণো এব, কিন্তু তিনিই একমাত্র যিনি ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়েছেন। হিন্দুমতে চতুর্বর্গ ফললাভই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ ট্র্যাজেডি তো ব্যর্থতারই চিত্রায়ণ করে। তাই ট্র্যাজেডি যে সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দর্শক বা পাঠক (অর্থাৎ সহৃদয়-জন)-এর তাদাত্ম্য স্থাপনের কথা যতদূর আসছে তাতে করুণ-রসের অসীম গুরুত্ব। সহৃদয়জনের সঙ্গে আশ্রয়-চরিত্রের তাদাত্ম্য স্থাপনাতে কবির সক্রিয় ভূমিকা থাকে এবং এই তাদাত্ম্যের সাহায্যেই রসাস্বাদন সম্ভব। এই তাদাত্ম্যই

সাধারণীকরণকে সম্ভব করে। করুণরসের পক্ষে তাদাত্ম্য স্থাপন খুব সহজ আর ট্র্যাজেডি হিন্দুসমাজে অনায়াসে সফল হতে পারত। করুণরসের এই ক্ষমতাকে বারবার কাজে লাগানো হয়েছে—"শকুন্তলা"র কথা অতি সহজে মনে পড়ে। তাই শেক্সপীয়র বা অন্যান্য নাট্যকারদের ট্র্যাজেডির প্রতি রসবাদের প্রয়োগ দুঃসাহসিক হলেও মূর্খতা হবে না।

ভরতমুনির "নাট্যশাস্ত্রে" অঙ্গীরসের উল্লেখ আছে এবং পরে আচার্য আনন্দ বর্ধন এই তত্ত্বটিকে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। বহু বাদবিতর্কের মধ্য থেকে আমরা এ বিষয়ে কয়েকটি সূত্র পাই। একটি লক্ষণ হল ব্যাপ্তি—যে রস কোন সাহিত্যকীর্তিতে সবচেয়ে বেশি প্রকট, সেটিই অঙ্গীরস। দ্বিতীয় লক্ষণ হল: নায়কের চরিত্র অঙ্গীরসেই পরিপূর্ণ হবে, অঙ্গীরসের ভাবসমূহই নায়ককে পরিচালিত করবে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই: যে রস নাটকের প্রধান ও সার্বিক ভাবটিকে সহৃদয়ের মনে পুষ্ট করবে, তা-ই অঙ্গীরস। "ওথেলো"র মত ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে—সবশেষে করুণরসই মনকে আবিষ্ট করে, তবে কি করুণই এখানে অঙ্গীরস? বিদগ্ধ পাঠক তখন সহজেই বলতে পারেন, যে-ভাব নায়ককে দৃশ্যের পর দৃশ্যে পরিচালিত করে অবশেষে দুঃখ ও বিনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেটি প্রেমভাব। তাই শৃঙ্গারকেই অঙ্গীরস বলে মেনে নেওয়া উচিত।

শৃঙ্গার রসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা দরকার। প্রেম অথবা রতি এই রসের স্থায়ীভাব। অনেক পণ্ডিত ও আচার্য এই রসের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকেই একে নানা প্রিয়নামে, নানা মধুভাবে ডেকেছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এর নাম দিয়েছেন উজ্জ্বল বা মধুর রস। সাধারণতঃ এর দুটি শ্রেণীবিভাগ ধরে নেওয়া হয়—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। ধনঞ্জয়াচার্য এই দুটি বিভাগকে একটু বদলে তিন রকম বিভাগ করেছেন—অযোগ, বিপ্রয়োগ ও সম্ভোগ।[৩] অযোগ ও পূর্বরাগ একই, অর্থাৎ যখন নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নন। এর নানারকম শ্রেণীবিভাগ আছে। বিপ্রয়োগকে আমরা বিরহ নামেও জানি—অর্থাৎ যেখানে নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। ধনঞ্জয়াচার্য এখানেও নানা বিভাগ দিয়েছেন। শৃঙ্গার রসের এই প্রথম দুটি বিভাগকে পণ্ডিতেরা প্রচুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। সম্ভোগ নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামান নি। এখানে নায়ক-নায়িকার মিলন সূচিত হয়। "দশরূপকে" ধনঞ্জয়াচার্য অযোগের বিষয়ে সাতটি শ্লোক দিয়েছেন, বিপ্রয়োগের বিষয়ে বারোটি, কিন্তু সম্ভোগের বেলায় তিনি মাত্র তিনটি শ্লোকে কাজ সেরেছেন।[৪]

"ওথেলো" নাটকে প্রেমই অন্য সব ভাবকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। ইয়াগো ছাড়া অন্য বড় চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই অনুরাগ দ্বারা কোন না কোন ভাবে অনুপ্রাণিত। রডরিগো ডেসডিমোনাকে ভালবাসে। সে এতই মূঢ় যে সে আশা করে যে ডেসডিমোনা কিছুদিন বাদেই ওথেলোর উপর বিরক্ত হয়ে তার দিকে ঝুঁকবে। এই আশায় সে নবদম্পতির পিছন পিছন সাইপ্রাস অবধি যায়। ক্যাসিওকে দেখার আগেই তার বিষয়ে আমরা জেনে যাই যে তার একটি সুন্দরী স্ত্রী আছে—A fellow almost damned in a fair wife। পরে দেখি বিয়াঙ্কার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়। এই অবৈধ প্রণয়ই ওথেলোর কাছে ডেসডিমোনার প্রবঞ্চনার চরম প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওথেলোর বিষয়ে বলা যায় ডেসডিমোনার প্রতি তার ভালবাসা যেন তার জীবনের মূল মন্ত্র। যে বাগবৈদগ্ধ্যের জন্য ডেসডিমোনা তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল সেই অপূর্ব বাগ্মিতার পরিচয় আমরা তখনই পাই যখন সে ডেসডিমোনার সঙ্গে বা তার বিষয়ে কিছু বলছে:

O my soul's joy!
If after every tempest come such calms
May the winds blow till they have waken'd death![৫]

পরেও আবার ডেসডিমোনার উদ্দেশে তার কাব্যোচ্ছ্বাস দেখি:

Excellent wretch! Perdition catch my soul
But I do love thee! and when I love thee not
Chaos is come again.[৬]

যখন এই প্রেমের প্রতি তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখনই তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। ওথেলো নিজেই বলেছে যে সে এমনই মানুষ যে "love not wisely but too well."

অন্যপক্ষে দেখি ওথেলোর প্রতি ডেসডিমোনার প্রেম এতই গভীর যে সে তার পিতার স্নেহাশ্রয় ছেড়ে গোপনে

ওথেলোকে বিবাহ করে। উইলো দৃশ্যটিতে সে বলছে :

my love doth so approve him
That even his stubbornness, his cheeks, his frowns,—
...—have grace and favour in them.[৭]

মৃত্যুর করাল মুহূর্তেও সে এমিলিয়াকে বলছে "Commend me to my kind lord ;" এই গভীর চিরস্থায়ী প্রেম বাগবৈদগ্ধ্যের মধ্য দিয়ে বা অন্য কোনও চিত্তাকর্ষক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে না। এই অন্তঃসলিলা চিরায়ত প্রেমকেই আচার্য বিশ্বনাথ নীলী শৃঙ্গার নাম দিয়েছেন :

ন চাতিশোভতে যন্নৈপৈতি প্রেম মনোগতম।
তন্নীলীরাগমাখ্যাতং যথা শ্রীরামসীতয়োঃ॥[৮]

আর বেশি গভীরে না গিয়েও এখানেই দেখি যে শৃঙ্গার রস নাটকটিতে ওতঃপ্রোত। এইসঙ্গে অন্যান্য অনেক রস এখানে রয়েছে এবং সর্বশেষে করুণরসই দর্শককে অর্থাৎ সহৃদয়জনকে অভিভূত করে। নাটকের ঘটনাসমূহ আলোচনা করার সময়ে দেখা যাবে কেমনভাবে বিভিন্ন রসের বিচিত্র লীলা আমাদের নাড়া দেয় আর অবশেষে বেদনার্ত সংহতি (tragic equilibrium)-তে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শৃঙ্গারই "ওথেলো"র অঙ্গীরস।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নাটকের বিষয়বস্তুই তার স্বরূপ নির্ণয় করে। ধনঞ্জয়াচার্য বলেছেন যে নায়ক ধীরোদাত্ত হবে আর যদি কথাবস্তুতে এমন কোন ঘটনা থাকে যা নায়কের চরিত্র বা অঙ্গীরসের বিরোধী, তাহলে সেই ঘটনাগুলিকে বাদ দিতে বা বদলে দিতে হবে :

যত্রত্রানুচিতং কিঞ্চিদ্ব্যায়কস্য রসস্য বা॥
বিরুদ্ধং তৎপরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥[৯]

শেক্সপীয়র নিজে যখন সিন্থিয়োর গল্পটি নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তিনিও ওথেলোর চরিত্রটিকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যাতে তার মধ্যে ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য আসে ও নাটকটিও সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে। "ওথেলো" নাটকের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রস গুরুত্ব পেয়েছে। অঙ্গীরস শৃঙ্গার কখনও অন্তঃসলিলা আবার কখনও তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম দৃশ্যটিতে বেশ অনেকখ ধরে নানা ভাবের লীলা দেখি কিন্তু এই ভাবগুলি (ক্যাসিওর প্রতি ইয়াগোর দ্বেষ ও ওথেলোর প্রতি রডরিগোর ঈর্ষা) কোনটিই রসে পরিণত হয়ে ওঠে নি। বিশ্বনাথ কবিরাজ বৎসলকেও রসের মর্যাদা দিয়েছেন : স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।[১০] তাঁর সঙ্গে সহমত হলে আমরা ব্রাবানশিওর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বৎসল রস পাব। দৃশ্যটি বেশ কিছুক্ষণ আগে থাকতেই এই রস উপভোগের জন্য পাঠককে তৈরি করে। আমরা জানতে পারি যে ডেসডিমোনা বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান, তার পিতাকে ত্যাগ করে এক "lascivious Moor"-কে বিবাহ করেছে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য ব্রাবানশিও অত্যন্ত বিরক্ত, কিন্তু ডেসডিমোনার গৃহত্যাগের কথা শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। রডরিগোর আনা খবরের সত্যতা জানতে পেরে তিনি আর্তস্বরে বিলাপ করে ওঠেন :

And what is to become of my despiséd time
Is nought but bitterness···O unhappy girl[১১]

এখানে স্পষ্টই পিতৃস্নেহের স্থায়ীভাবের আধারে বৎসল রসের প্রকাশ দেখি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এখানে ব্রাবানশিও আশ্রয় (recipient), ডেসডিমোনা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে-ই আলম্বন (fundamental determinant) মাঝরাতে ঘুম ভাঙা, ইয়াগো আর রডরিগোর আনা খবরগুলি উদ্দীপন বিভাব। ব্রাবানশিও-র ব্যথা, বিলাপ, হতাশা, প্রবঞ্চিত হওয়ার গ্লানি ইত্যাদি অনুভাব (consequent)। ব্রাবানশিও নিজে এক যে কোন সাধারণ বৃদ্ধ পিতা যিনি তাঁর সন্তানকে অসম্মানের পথ বেছে নিতে দেখছেন। সহৃদয়জন অনায়াসে তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্য (identification) স্থাপন করে। পাঠক যে ভাব অনুভব করে তা ব্রাবানশিওর দুঃখ নয়, পাঠকের নিজের সন্তান বিচ্ছেদের কল্পিত দুঃখও নয়। অপত্যস্নেহ দেশকালের উপরে সাধারণীকৃত হয়ে পাঠকের মনকে বৎসল রসরূপে আবিষ্ট করে। কবির ক্ষমতা পিতৃস্নেহকে এক অপূর্ব রূপান্তর দেয়। তখনই "চমৎকার" ঘটে—স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ। পাঠক বুঝতে পারেন হঠাৎ যেন এক গভীরতা, এক অনির্বচনীয় তীব্রতা তাঁর অনুভূতির জগৎকে সাধারণ অভিজ্ঞতার ওপরে তুলে দিয়েছে—অর্থাৎ তিনি রসোপলব্ধি করছেন, যা "ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ"।

রসাস্বাদনের পরবর্তী দৃষ্টান্ত ওথেলোর বিখ্যাত সংলাপ Her father loved me ইত্যাদি। এ দৃশ্যটিতে এর আগে আমরা বিভিন্ন ভাবের উত্থানপতন দেখি। ক্যাসিওর

সঙ্গে সংলাপ, ব্রাবানশিও ইত্যাদির দৃশ্য, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশ এই সবগুলিকেই প্রকরী বলা যায়। ধনিকাচার্য বলেছেন যে প্রকরী হল নাটকের সেই অংশ যা প্রধান ঘটনার সঙ্গে অল্পসময়ের জন্য চলে :

যদল্পং সা প্রকরী শ্রবণাদিবৃত্তান্তবৎ[১২]

ওথেলোর শঠতার বিরুদ্ধে ব্রাবানশিওর কথাগুলি বিন্দু হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ এটি প্রধান অংশের সঙ্গে যোগসূত্র :

অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরুচ্ছেদকারণম্[১৩]

ওথেলোর বক্তৃতায় নানা বিচিত্র রসের অনবদ্য স্বাদ পাওয়া যায়, যদিও শৃঙ্গারই প্রধান। প্রথমে শৃঙ্গার অন্তঃসলিলা। অদ্ভুত ও করুণরসই প্রধান। ওথেলোর ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী খুবই রোমাঞ্চকর কিন্তু সেই সঙ্গে করুণও।

'twas strange, 'twas passing strange
'twas pitiful, 'twas wondrous pitiful[১৪]

ওথেলো তার অসাধারণ বাগ্মিতার বলে মঞ্চের উপরই যেন প্রশস্ত প্রান্তর ও গুহাকন্দরের (antres vast and deserts idle) সৃষ্টি করে। কিছুক্ষণের জন্য সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। ওথেলোর কাহিনী এখানে উদ্দীপন, ডেসডিমোনা আশ্রয় আর ওথেলো নিজে আলম্বন। সহৃদয়জন বিশুদ্ধ অদ্ভুতরস উপভোগ করেন। যখন ওথেলো তার গল্পের প্রতি ডেসডিমোনার আগ্রহ মনোযোগের কথা বলে তখন শৃঙ্গার রস ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে

And bade me, it I had a friend that lov'd
her,
I should but teach him how to tell my story,
And that would woo her. Upon this hint I
spake :
She lov'd me for the dangers I had passed,
And I lov'd her that she did pity them[১৫]

এখানে আমরা অনুরাগের খুব সংযত প্রকাশ দেখি। এই অনুরাগ শান্ত ও চিরস্থায়ী। লীলাবিভ্রমের সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে না। অর্থাৎ যাকে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন নীলী শৃঙ্গার[১৬]। কয়েক ছত্র পরে যখন ডেসডিমোনা ওথেলোর সঙ্গে যাবার আবেদন করে তখন শৃঙ্গার রস আবার উদ্বেল হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভেও একটি প্রকরী আছে। মন্টানো ও অঙ্গীরুদের মধ্যে সংলাপের দৃশ্য এটি। ক্যাসিও-কৃত ডেসডিমোনার বর্ণনা বিন্দুর কাজ করে আমাদের প্রধান ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ওথেলোর নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য ক্যাসিওর প্রার্থনাতে শৃঙ্গার প্রমুখ হয়ে ওঠে : Make love's quick pants in Desdemona's arms ইত্যাদি।

ডেসডিমোনার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গার মুখারস হয়ে ওঠে। সকৌতুক হাস্যালাপের মধ্য দিয়েও ভুলতে পারি না যে ডেসডিমোনা উৎসুকচিত্তে ওথেলোর বিষয়ে খবর জানবার প্রতীক্ষা করছে। ওথেলোর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গার উচ্ছ্বসিত হয় :

O my soul's joy !
If after every tempest come such calms
may the winds blow till they have
waken'd death !
.....
If it were now to die
'Twere now to be most happy.....
I cannot speak enough of this content
It stops me here ; it is too much of joy[১৭]

ওথেলো এখানে আশ্রয় ও ডেসডিমোনা আলম্বন। ওথেলোর নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তন, দুজনের মিলন, ডেসডিমোনার সৌন্দর্য—এ সবই উদ্দীপন। এখানে শৃঙ্গারের যে স্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাকে মঞ্জিষ্ঠা শৃঙ্গার বলা যায় কারণ প্রেম এখানে গভীর, আর খুবই চমৎকারভাবে তার প্রকাশও ঘটেছে। অতি উঁচুদরের কাব্য, চুম্বন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে পাঠক বা দর্শক এখানে মঞ্জিষ্ঠা শৃঙ্গারের ঐশ্বর্যময় দীপ্তি অনুভব করেন : মঞ্জিষ্ঠারাগমাহুস্তদ যন্নাপৈত্যতিশোভতে।[১৮] ওথেলো যে "মূর" আর ডেসডিমোনা একটি সম্ভ্রান্ত ভিনীসীয় মহিলা সে কথা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। এখানে তারা দুজনেই সাধারণীকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা। সহৃদয়জন বিশুদ্ধ শৃঙ্গাররস উপভোগ করেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে আমাদের উদ্দেশ্য এই নাটকের মাধ্যমে যে বিভিন্ন রসের আস্বাদ গ্রহণ করি তার বিশ্লেষণ করা, নাটকের গঠনশৈলী বিচার করা নয়। তাই ঘটনাপ্রবাহ অথবা প্লটকে নাটককৌশলের দিক থেকে বিচার করার চেষ্টা করা হয় নি। কখন কখন পতাকা, বিন্দু ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু রসাস্বাদনের

উপলব্ধিকে ঠিকমত বোঝার জন্যই শুধু এ শব্দগুলির উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কলাকৌশল দিয়ে জেকোবিয়ন নাটককে বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়।

ওথেলো যখন গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন তখন নির্বেদ, শঙ্কা, দৈন্য, বিষাদ, ত্রাস ইত্যাদি নানা ব্যভিচারী ভাব তার মনে ঝড় তুলেছে। তার হতাশা এতই তীব্র যে নিচের এই বিখ্যাত ছত্রগুলি করুণরসের সৃষ্টিই করে :

Farewell the plumed troops and the big wars
That make ambition virtue.....
Pride, pomp and circumstance, of glorious
war ![১৯]

যেমন যেমন দৃশ্যটি অগ্রসর হয় তেমনই বিষাদের পর অমর্ষভাব (জিঘাংসা) প্রবল হয়ে ওঠে :

O that the slave had forty thousand lives !
One is too poor, too weak for my revenge[২০]

নায়কের চরিত্রের বিষয়ে কয়েকটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগে বলা হয়েছে ওথেলোর মধ্যে ধীরোদাত্ত নায়কের অনেক লক্ষণ আছে। ধনঞ্জয়াচার্য বলেছেন ধীরোদাত্ত নায়ক

মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ
হিরো নিগূঢ়াহঙ্করো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ[২১]

এইরকম নায়ক স্থিতধী, গম্ভীর ও ক্ষমাশীল। সে কখনই আত্মপ্রশংসা করে না কিন্তু একটি শান্ত অহঙ্কার ও দৃঢ়তা তার মধ্যে আছে। এই ধরনের নায়ক এরিস্টটলের great souled man-এর মত। ওথেলোর মধ্যে ধীরোদাত্ত নায়কের মাত্র দুটি লক্ষণই আমরা পাই না। সে মহাসত্ত্ব নয়, যার শান্ত স্বভাব সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত হয় না। লোডোভিকো তার বর্ণনা দিচ্ছে—

Nature whom passion could not shake
.....
whose solid virtue
The shot of accident, nor dart of chance
Could neither graze nor pierce[২২]

আবার লোডোভিকো বলছে :

Is it his use ?
Or did the letters work upon his blood
And new create this fault ?[২৩]

অর্থাৎ সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে ওথেলোর স্বভাব এত বদলে গিয়েছে। আমরা দেখি ওথেলোর স্বভাব মোটেই দৃঢ়ব্রত নয়। সে নিজে বলছে :

One not easily jealous, but being wrought
Perplexed in the extreme.[২৪]

ওথেলো ক্ষমাশীলও নয় কারণ আমরা দেখি সে ক্যাসিওকে (দ্বিতীয় অঙ্ক, দৃশ্য ৩) লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছে। ক্যাসিও বা ডেসডিমোনাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। এই দুটি গুণ—মহাসত্ত্বতা ও ক্ষমাশীলতা ওথেলোর আদর্শ নায়ক হবার পক্ষে বাধা।

নায়িকার চরিত্রে মুগ্ধা নায়িকার প্রায় প্রতিটি লক্ষণই পরিস্ফুট। ধনঞ্জয়াচার্য মুগ্ধা নায়িকার দেহসৌন্দর্যের কথা বলেছেন কিন্তু চরিত্রের অন্যান্য লক্ষণগুলির কথা বিশেষ বলেননি। ডেসডিমোনার সহজশীলতাই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যখন সে কন্যা ও স্ত্রী হিসাবে তার কর্তব্যের কথা বলে (১.৩.১৮১-১৮৯)। পরেকার কথা ও ব্যবহারে ওথেলোর প্রতি তার অসীম আনুগত্য ফুটে ওঠে। এ আনুগত্য গভীর ভালবাসা থেকেই এসেছে :

my love doth so approve him
That even his stubbornness, his cheeks,
his frowns,—
.....have grace and favour in them[২৫]

তার পবিত্রতা এতই নির্মল যে সে বিশ্বাস করতে পারে না যে কোনও স্ত্রী তার স্বামীকে প্রবঞ্চনা করতে পারে। তার প্রেম এত গভীর ও ক্ষমাশীল যে মৃত্যুর মুহূর্তেও সে ওথেলোকে বাঁচাবার চেষ্টা করে :

Emilia : O, who hath done this deed ?
Des. : Nobody. I myself. Farewell.
Commend me to my kind lord :
O, farewell[২৬].

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই নাটকের বহুস্তরীয় সৌন্দর্যের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। অন্য চরিত্রগুলির প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত করা হয়নি। নাট্যশৈলী বা কাব্য-সৌন্দর্যও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই ধরনের আলোচনায় অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। বহুপলবিশিষ্ট একটি রত্নের কেবল একটি দিকের দীপ্তিই যেন আমরা এখানে দেখলাম।

সূত্র নির্দেশ :

১। Sahityadarpana with Vimala Commentary Viswanatha Kaviraaj, Motilal Banarasidas, New Delhi 1977. p.109
২। The Dasarupa : A Treatise on Hindu Dramaturgy. Translated by George C. O. Hoas. MLBD, New Delhi 1962 III, 33
৩। ঐ চতুর্থ প্রকাশ ৫০তম শ্লোক
৪। ঐ চতুর্থ প্রকাশ ৫০-৭১
৫। The Complete Works of Shakespeare ed. W.T. Craig, OUP '57 Othello, II, i 187-189 সব কটি উদ্ধৃতি এখান থেকে নেওয়া হয়েছে।
৬। ঐ III, iii, 90-92
৭। ঐ, IV, iii, 19-21
৮। Sahityadarpana with Vimala Commentary, Viswanatha Kaviraja MLBD, New Delhi 1977.
৯। দশরূপক তৃতীয় প্রকাশ ২২-২৪
১০। সাহিত্যদর্পণ, ৩, ২৫১
১১। ওথেলো, ১, ১, ১৬২-৪
১২। দশরূপক ১, ১৩ টীকা
১৩। ঐ ১, ১৭
১৪। ওথেলো, ১, ৩, ১৬০-১
১৫। ঐ ১, ৩, ১৬৪-৫
১৬। সাহিত্যদর্পণ পৃ ১০৯
১৭। ওথেলো, ২, ১, ১৮৯-২০১
১৮। সাহিত্যদর্পণ পৃ. ১০৯
১৯। ওথেলো, ৩, ৩, ৩৫০-৫৫
২০। ঐ, ৩, ৩, ৪৪৩-৪
২১। দশরূপক পৃ. ৪১
২২। ওথেলো, ৪, ১, ২৭৬-৭৯
২৩। ঐ, ৪, ৩, ১৯-২১
২৪। ঐ, ৫, ২, ৩৪৫-৪৫
২৫। ঐ ৪, ৩, ১৯-২১
২৬। ঐ, ৫. ২, ১২৬-২৮

প্রসঙ্গ সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা

১৯৯২এর আগস্টের সংখ্যায় 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক হিসাবে সে সম্পর্কে কিছু জানাবার আছে। সমালোচনাটির তিনটি ভাগ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (তথা ব্র. স.) সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের প্রশংসা, সটীক সংস্করণের ত্রুটিবৃত্তান্ত ও তৎপরে প্রশংসা। সমালোচিত গ্রন্থের পক্ষ নিয়ে কিছু বলা প্রচলিত রীতিবহির্ভূত তবে ব্র. স. সম্পাদিত সংস্করণ সমালোচিত হয় নি, সে কারণে তার পুনরালোচনা বোধহয় চলতে পারে।

১.১) সমালোচনাতে ব্র. স. সম্পাদিত সংস্করণ প্রসঙ্গ শুধু এই জন্য আসেনি যে সেটি পূর্ববর্তী সংস্করণ, এসেছে কারণ সটীক সংস্করণের ব্লার্বে বলা হয়েছে হালআমলে প্রকাশিত নকশার পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে "মূল ভাষা মার্জিত করা হয়েছে, শব্দার্থ জানা না থাকায় মুদ্রণপ্রমাদ ধরে নিয়ে ভুল শব্দ বসানো হয়েছে, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে হুতোম লিখিত মূল ভূমিকাই বাদ।" সমালোচক মশায়ের ঘোর আপত্তি, তিনি বলেছেন, "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৩৪৫ সালে হুতোম প্যাঁচার নকশা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসাবে পুনর্মুদ্রণ করেন তখন কি তিনি মূল পাঠ গ্রহণ করেন নি? দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বইগুলিতে ছাপার ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সচেতনভাবে সেখানে মূল ভাষা মার্জিত করা হয়েছে বা ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের কোথাও ভুল হতে পারে না, তা নয়; কিন্তু পাঠনির্ধারণে তিনি যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ আছে। পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পাদনায় হুতোম প্যাঁচার নকশার 'নূতন সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। কোনো সন্দেহ নেই বাংলা বইয়ের সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে ছাপার ভুল বেড়েই যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবর্ণরেখা সংস্করণের সঙ্গে পরিষৎ-সংস্করণ (১৩৫৫) মিলিয়ে দেখলে পাঠভেদ খুব বিরাট বলে মনে হয় না।"

১৩৪৫ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে একই সম্পাদনায় নকশা ১৩৪৪-৪৫ সনের 'শনিবারের চিঠি'-তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ছোটোখাটো কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ বাদ দিলে সেই পাঠ থেকে শুরু করে সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ (১৩৯১) পর্যন্ত পাঠ এক, সুতরাং সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোধহয় খুব অন্যায় হবে না। পাঠ তুলনার ভার সুধী পাঠকের।

১৮৬৮-র মূল পাঠ

'ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আকড়ার মজা ভর পুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্ ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখতে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো।' পৃ. ৩৮

ব. সা. প. সংস্করণ (১৩৯১)

'ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্ ঠাণ্ডাই জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখ্‌তে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরা কাজ আপনার আপনার মনিবের বাড়ি ফিরে গ্যালো।' পৃ. ৩০

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৮৬৮-র মূল পাঠ

'…কামার কোমোর বেঁধে প্রতিমের কাচ্ থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে হাড়কাটের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ্ থোকে অ্যাক্ জন মোসাহেব "খুটী ছাড়! খুটি ছাড়।" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাটে পুরে দিয়ে খীল এঁটে দেওয়া হলো, অ্যাক্‌জন পাঁঠার মুড়ি ও আর অ্যাক্ জন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার জয় মা! মা গো! বোল্যে কোপ তুল্লে…কামার শরাতে সমাংস করে দিলে পাঁঠার মুড়ির মুখ চোপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে অ্যাক্‌জন মোসাহেব সম্তর্পণে খর্পরের শরা আচ্ছাদন করো প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাত্তালী দিতে দিতে…' (২য় ভাগ) পৃ. ১০-১১

ব. সা. প. সংস্করণ (১৩৯১)

'…কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাণে আশীর্ব্বাদী ফল গুঁজে হাড়-কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব "খুটি ছাড়! খুটি ছাড়!" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাটে পুরে খিল এঁটে দেওয়া হলো,

একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার "জয় মা! মা গো!" বলে কোপ তুল্লে… কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে একজন মোসাহেব সম্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদান করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে…' পৃ. ১১৭

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, এমন পরিমার্জনের উদাহরণ প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। সমালোচক মশায়ের প্রসঙ্গান্তরে মন্তব্য "সাধারণভাবে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের দিকে নকশাকারের ঝোঁক ছিল (দ্বিতীয় সংস্করণের গৌর-চন্দ্রিকায়—সুদ্ধ, অ্যাকবার, ক্যান, কত্তে পাত্তেন, অ্যামন, অ্যাত, যামন)। ফলে হুতোমের আদি রূপটিকে রক্ষা করতে হলে বানান অবিকৃত রাখতে হবে।" ঠিক, অতি সঙ্গত কথা। এই কারণেই আমরা হুতোমের বানান পালটাইনি। কিন্তু 'পাঠনির্ধারণে সতর্ক' ব্রজেন্দ্রনাথ তা করলেন না কেন, জানিনা, তবে সমালোচক মশায়ের চোখে কেন সেই পাঠভেদ খুব বিরাট বলে মনে হল না, তা আন্দাজ করতে পারি।

১.২) ভুল শব্দ বসানোর উদাহরণ, "বীরকৃষ্ণ বাবু ধূপ-ছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেট্‌ওয়ালা (ঝাড়ের গোলাপের মত) কামিষ্ঠ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন…" (ব. সা. প. ১৩৯১ সং পৃ. ২১)। মূল পাঠে আছে 'গেলাপ', অর্থ কাপড়ের ওয়াড়, খোল, ঢাকনা—ঝাড়লণ্ঠনকে ধুলোবালি থেকে বাঁচাতে ঢাকনা পরিয়ে রাখা হত। বীরকৃষ্ণকে কাপড়মোড়া ঝাড়লণ্ঠনের মত বেঢপ দেখাচ্ছে। "টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বল্লেন, "ও মা, আজকাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুলোমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীতে দোরস্ত কত্তেম্!" (ঐ, পৃ, ৬৪)। মূল পাঠে আছে 'মুড়োমুড়ি', অর্থ এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো, আগাপাশতলা।

১.৩) হুতোম লিখিত মূল ভূমিকা বাদ দেওয়ার প্রশ্ন। হুতোমের প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯, দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৬২ খ্রি.) ১৮৪, পরিমার্জিত প্রথম ভাগের (১৮৬৮ খ্রি.) ১৪০। অন্যান্য সংস্করণ থাকলেও এদের উল্লেখ করা হল কারণ এরা প্রত্যেকেই এক একটি ভূমিকায় ভূষিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা থেকেই আন্দাজ করা যায় কতটা পরিবর্ধন-বর্জন ঘটেছে তিনটি সংস্করণে। প্রথম সংস্করণে চার পঙ্‌ক্তির 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে যে ভূমিকা তাকে ভূমিকা না বলাই উচিত, কিন্তু পরবর্তী দুটি সংস্করণের বিশেষ করে তৃতীয়টির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এদের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ৪। ব্র. স. একটিও ভূমিকা ছাপেননি, অন্তত, যে ১৮৬৮ সংস্করণকে 'মূল পাঠ' বলেছেন, তার জন্য পৃথকভাবে লেখা ভূমিকাটি যে কেন বাদ দিলেন, বোঝা দুষ্কর। আমাদের বক্তব্য তাই ছিল। সমালোচক মশায় ব্র. স.-এর ত্রুটি লঘু করে দেখাতে মন্তব্য করেছেন "…প্রথম সংস্করণের চার লাইনের 'বিজ্ঞাপন'টি পরিষৎ-সংস্করণে থাকা উচিত ছিল, যদিও এটিকে 'মূল ভূমিকা' বলা যাবে কিনা সন্দেহ।" আমরা কোথাও ওটিকে মূল ভূমিকা বলিনি, তিনি আপাত-তুচ্ছ বিজ্ঞাপনটির কথা উল্লেখ করেছেন অপর দুটি অমুদ্রিত ভূমিকার কথা না বলে, দ্বিতীয়ত যেটিকে তাঁর বিবেচনা মতে 'মূল ভূমিকা' নিঃসন্দেহে বলা যাবে সেটি ব্র. স. ছাপলেন না কেন তারও কোন জবাব নেই।

১.৪) সমালোচক মশায় পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, "তবে ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের অপরাধ, তাঁরা ভূমিকায় বলেছেন 'আমরা ১৮৬৮ সালে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকে মূল আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রণ করিয়াছি…তবে এই সংস্করণে যে যে স্থলে শব্দ ও পংক্তি পড়িয়া গিয়াছে, প্রথম সংস্করণের (১৮৬২ সংস্করণ, অ. ম'.) পাঠ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।" এই প্রসঙ্গ আমরা তুলিনি, সমালোচক মশায় কেন তুললেন তাও জানি না। সমালোচনাটা তো ব্র. স. সম্পাদিত সংস্করণের নয়। তবু তুলে ভাল করেছেন এইজন্য যে আমাদের প্রমাণ করতে অধিকতর সুবিধা হবে টীকা, পাঠভেদ বাদ দিয়েও কেন নকশার আর একটি সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। আর একটি কথা বলা দরকার। সমালোচক মশায় প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে পুরনো বই পুনর্মুদ্রণের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তার মধ্যে নিষ্ঠা পরিশ্রম বা দায়িত্ববোধ দূরে থাক, কোন রকম সম্পাদনানীতি বা সততাবোধের পরিচয় থাকছে না। ব্র. স. সম্পাদিত সংস্করণ পঁচিশ বছরের অনেক আগে প্রকাশিত, আশা করা যায় তাঁদের নির্দিষ্ট সম্পাদনা-নীতি ছিল। উদাহরণ দেওয়া যাক, সব উদাহরণ একটি নকশা থেকে, 'বারোইয়ারি'—

১৮৬২ সংস্করণের পাঠ

১ ...'গাড়োয়ানরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়" ইত্যাদি কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্চে।'

২ '...মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্‌ডায় জমচেন'

৩ '...কাঙ্গালি, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—কিন্তু পুলিসের ড্যামকেষ্টো বাবুর পরামর্শে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের অনুগ্রহে পাহারাওলারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয়!'

৪ '...ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে আদ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিসে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন!'

১৮৬৮ সংস্করণের পাঠ

১ ...গাড়োয়ানরা হাসি টিক্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়!" কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্চে!'

২ '...মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান গুলির আড্‌ডায় জমচেন'

৩ '...কাঙ্গালি, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয়!'

৪ '...ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন!'

ব্র. স. সম্পাদিত (১৩৯১) সংস্করণের পাঠ

(১) ...গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়?" কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!'

২ '...মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন'

৩ (১৮৬৮-র অনুরূপ)

৪ '...ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিশে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন!'

এইরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে ব্র. স. অনুসৃত সম্পাদকীয় নীতিটি যে সত্যই কী তা অন্তত আমরা বুঝতে পারিনি।

সমালোচক মশায় যে সাধারণ পাঠকের দলে পড়েন না, এমন আভাস দিয়েছেন এবং আমাদের তাতে দ্বিমত নেই। একই প্রকার বিশেষজ্ঞতার পরিচয় তিনি সটীক সংস্করণের আলোচনাতেও রেখেছেন, তবে সে প্রসঙ্গ তো এখানে তোলা যায় না। ইতি

নিবেদক
অরুণ নাগ
শান্তিনিকেতন

চা-বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন

চতুরঙ্গ পত্রিকার ৫৩ বর্ষ, সংখ্যা ৫-৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) প্রকাশিত 'বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন' শীর্ষক নির্বাণ বসু লিখিত প্রবন্ধ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রচনা। লেখক বিভিন্ন পত্রিকা, সরকারি নথিপত্র এবং পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এইরূপ তথ্যপূর্ণ লেখা প্রকাশের জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ।

চা-বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে (৩৮৩ পৃষ্ঠায়) স্পেশাল ব্রাঞ্চের নথিপত্র থেকে লেখা হয়েছে "একমাত্র চট্টগ্রামের চাবাগানেই যুদ্ধের সময়ে আন্দোলনের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এখানে সংগঠন সর্বপ্রথম শুরু করেন কল্পতরু সেনগুপ্ত, নগেন দের মত কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু যুবক যাঁরা তখনও তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসেরই সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁরা গঠন করেন চট্টগ্রাম চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন। মালিকপক্ষের সৃষ্ট অসন্তুষ বিদ্বের মধ্যে গোপনে বাগানে বাগানে ঘুরে তাঁদের কাজ করতে হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে বুলিয়ন কোম্পানি পরিচালিত ৬টি বাগানে ন্যূনতম মজুরি সরকারি অ্যাওয়ার্ড রূপায়ণ প্রভৃতি দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘকাল চলার পর এই আন্দোলন অবশ্য ভেঙে যায়।"

এই অংশের সঙ্গে আমি আরও যোগ করতে চাই, যা প্রকাশ হলে একালের পাঠকরা জানতে পারবেন যে কী ভাবে আন্দোলন শেষ হয়েছিল। 'ভেঙে যায়' কথাটি উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ নয়।

অ্যাওয়ার্ডের পটভূমি ছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। তখন কোন বাগানে রেশন দিত না। যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ মালিকরা কিছুটা নিয়মকানুন মানলেও ভারতীয় মালিকরা আইন মেনে বাগান চালাত না। বুলিয়ন কোম্পানির মালিক বাগানের দায়িত্ব কতিপয় কর্মচারীর উপর দিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ চট্টগ্রাম তখন যুদ্ধ-সীমান্ত জেলা। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চা-শ্রমিকরা অনাহারে মরে, খাদ্য অন্বেষণে গ্রামে এসে পথে মরে পড়ে থাকে। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সর্বাধিক মরেছে বুলিয়ন কোম্পানির চা-শ্রমিকরা। এই পরিস্থিতির সূচনাতে ইউনিয়ন কলকাতায় লেবার কমিশনারকে পরিস্থিতি জানিয়ে রেশন, মজুরি বৃদ্ধি, বাগান চালু রাখা ইত্যাদি দাবি জানায়। চা-শ্রমিকদের সম্মেলন সংগঠিত করে। সেই সম্মেলনে শ্রমিক নেতা আবদুল মোমিন উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে লেবার কমিশনারকে পরিস্থিতি জানান। লেবার অফিসার সুরেন্দ্রনাথ দাশ সমস্ত বাগান পরিদর্শন করে ইউনিয়নের দাবি অবিলম্বে কার্যকরী করার সুপারিশ করেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সহকারী লেবার কমিশনার এবং অ্যাকটিং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্সি ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে অ্যাওয়ার্ড জারি করেন ভারত-রক্ষা আইনে। কিন্তু বুলিয়ন কোম্পানি তা মান্য না করে বাগানের অফিসও বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে। তখন অ্যাকটিং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারত-রক্ষা রুল অনুযায়ী বুলিয়ন কোম্পানির মালিক চাঁদমল ভাটিয়াকে গ্রেপ্তার করে এস ডি ওর কোর্টে হাজির করার নির্দেশ জারি করেন। ভাটিয়াকে হাতকড়ি দিয়ে কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এনে হাজতে আটক রাখা হয়। সম্ভবত এবিষয় নিয়ে ইউরোপিয়ান চা-বাগান মালিকরা আপত্তি জানিয়েছিল এবং উপর মহলের সঙ্গে মিঃ ম্যাকিনার্সির মতানৈক্য হয়। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটি কলেজে অধ্যক্ষের কাজ গ্রহণ করেন।

ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মালিক পরিত্যক্ত ৬টি বাগানে প্রুনিং, প্লাকিং ইত্যাদি কাজ চালিয়ে যাবে বাগান রক্ষার জন্য। প্লাকিং করে সেই পাতা হাতে মলাই করে রোদে শুকিয়ে চা উৎপাদন করে নিজেরা পান করবে এবং বাজারে বিক্রি করবে। তখন যুদ্ধের সময় চা-র খুব চাহিদা ছিল, বাইরের চা জেলায় আসছিল না। এই সিদ্ধান্ত খুবই কার্যকরী হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাপারীরা চা নিতে আসত। চাহিদার চাপে হাতমলাইর পরিবর্তে পা মলাই করে চা উৎপাদন বাড়াতে হত। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পর কোন শ্রমিক অনাহারে মরেনি, উপরন্তু তাদের হাতে দু-পয়সা আসে। অন্যান্য বাগানের শ্রমিকরা উদ্বুদ্ধ হয়, গ্রামের কৃষকরা বাহবা দিতে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় বাগানের ম্যানেজাররা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপত্তি জানায়, আবগারী বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে আমি পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘটনা স্বীকার করি। তিনি বলেন, প্রাণ বাঁচানো পুণ্যের কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মিঃ ম্যাকিনার্সি একজন ধর্মযাজকের সন্তান এবং তিনি নিজেও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যাবার পর জেলা কর্তৃপক্ষের থেকে চাপ আসতে থাকে, বলা হয় বেআইনী চা ব্যবসা হচ্ছে। এস. ডি. ও. মিঃ গুহ সহানুভূতিশীল থাকায় উৎপাদন ও বিক্রয় সম্ভব হচ্ছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়। দেশভাগের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। আবগারী অফিসাররা স্থানীয় আনছার বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনঘন হানা দিতে থাকে। বাগানের নেতারা গা ঢাকা দিয়ে কাজ চালাতে থাকেন। বাগান থেকে চা নিয়ে যাবার পথে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চা আটক করে আবগারী কর্মচারীরা। একটা প্রচার চালায় যে নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছে চাবাগানের শ্রমিকরা। তারপর একদিন মধ্যরাত্রে বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে আবগারী কর্মচারীরা কৈয়াছড়া বাগানে হানা দেয়। ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশীর নামে উৎপাদিত চা মাটিতে ঢেলে দেয়, শ্রমিকদের মারপিট করে, নারীর শ্লীলতাহানি করে। শ্রমিকরা বাধা দিতে এগিয়ে এলে পুলিস গুলি চালায়। গুলিতে শ্রমিক রবিদাস নিহত হয়, ৭ জন আহত হয়। ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। অবশিষ্ট শ্রমিকরা পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে। বাগানে পুলিস ক্যাম্প বসে।

এই ঘটনার পর থেকে প্রকাশ্যে ইউনিয়ন চালানো সম্ভব হয় না। ইউনিয়নের সভাপতি বর্তমান পত্র লেখককে রাঙ্গাপানি বাগানে মধ্যরাত্রিতে আনছাররা এমন অমানুষিক প্রহার করে যে তিনমাসকাল তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

ইউনিয়নের সেক্রেটারি নগেন দে বর্তমানে জীবিত নাই। তিনি আন্দামানে নির্বাসিত বন্দী ছিলেন। মুক্তিলাভ করার পর চা-শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আরেকজন সংগঠক বিভূতি দাস জেলা কংগ্রেস সভাপতির পরিবারের।

তিনিও জীবিত নাই। চাবাগান শ্রমিকদের সেদিনের আন্দোলন ও জীবনদানের কথা আজও চট্টগ্রামে চা-বাগান অঞ্চলে কথিত হয় গল্পের মত। ইতি

নিবেদক
কল্পতরু সেনগুপ্ত
এইচ্ এ 186 সল্টলেক (৩) কলকাতা-৭০০০৯১

'মাটি শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা নয়

রউফ সাহেব, নভেম্বরের 'চতুরঙ্গ' বিলম্বে প্রকাশিত হলেও চমৎকার রচনাসম্ভারে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের লেখাগুলি হীরামুক্তামাণিক্যের মতো হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মীনাক্ষি ঘোষ লিখিত ছোট গল্প—'সৌর দিনকে পার করে' পড়ে রীতিমত অভিভূত হয়েছি। এমন সূক্ষ্ম অনুভূতির কাহিনী অধুনা আর বড় নজরে পড়ে না। লেখিকাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মাটি' শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা নয়, সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ। এটি ধারাবাহিক ভাবে বেরুলে একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হতে পারবে—যেমন সমুদ্র নিয়ে তিনি লিখেছেন। তাঁর একাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রবিবাসরে শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। যত শুনি ততই মনে পড়ে—আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'-র ভাষা ও ব্যঞ্জনা। ড: মুখোপাধ্যায় যদি অনুগ্রহ করে এভাবে বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত লিখেন তবে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিপ্রায় সার্থকতা লাভ করবে।

নিবেদক
সন্তোষকুমার দে
১৪৬ কবি নবীন সেন রোড
কলিকাতা-২৮

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers
Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves
New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines
Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets
More reliable. More economical.

Soil Moisture Meter
Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service
Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

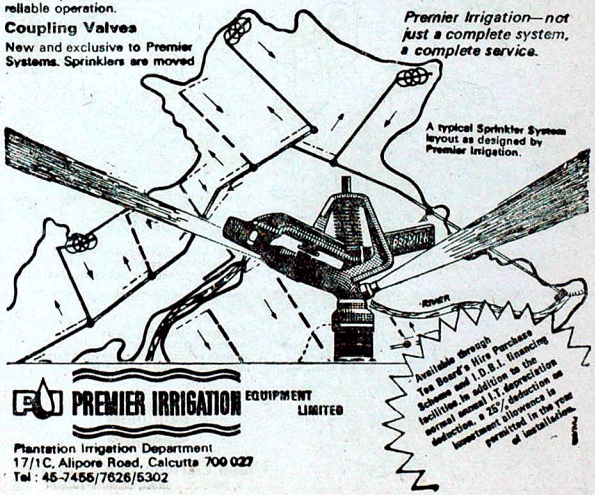

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302